Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিশোর ম্যাগাজিন

# আলো

৫ম সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

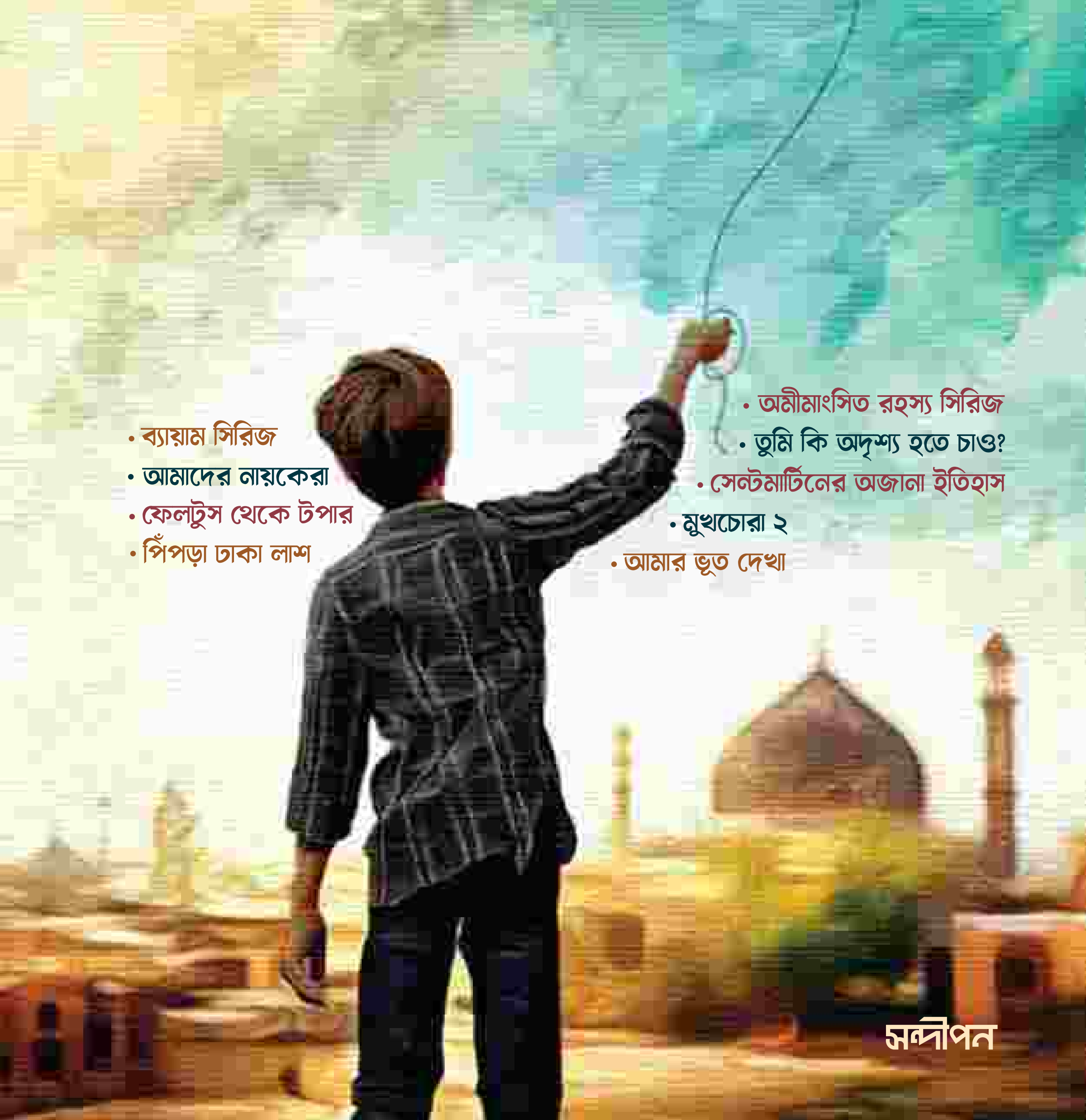

- ব্যায়াম সিরিজ
- আমাদের নায়কেরা
- ফেলটুস থেকে টপার
- পিঁপড়া ঢাকা লাশ

- অমীমাংসিত রহস্য সিরিজ
- তুমি কি অদৃশ্য হতে চাও?
- সেন্টমার্টিনের অজানা ইতিহাস
- মুখচোরা ২
- আমার ভূত দেখা

সন্দীপন

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

MHR Academy

# কৈশোরেই শুরু হোক স্কিল ডেভেলপমেন্ট

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই সময়ে জীবনযুদ্ধের দৌড়ে এগিয়ে যেতে স্কিল ডেভেলপের বিকল্প নেই

***ফ্রিল্যান্সিং জগতে SEO এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই MHR Academy এর Basic To Advance SEO কোর্সে এনরোল করো। আর হয়ে যাও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের বস !***

এই কোর্স করে তুমি যা যা শিখবে :

১. গুগল সার্চে ওয়েবসাইটের Ranking বাড়ানো

২. হালাল উপার্জন করার দক্ষতা অর্জন

৩. হালাল ও হারাম ক্যাটাগরির SEO এর মাঝে পার্থক্য করার দক্ষতা

কোর্স ইনস্ট্রাক্টর :
Muhammad Rafiuzzaman

কোর্স ফি : ৫০০০ টাকা মাত্র

কোর্সের মেয়াদ : ০৩ মাস

কোর্স সম্পর্কিত বিস্তারিত জানতে ভিজিট করো: www.mhrracademy.com
ফেসবুক : www.facebook.com/mhracademy
হটলাইন : 01772115611

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পঞ্চম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩
গ্রন্থস্বত্ব © ষোলো

সম্পাদনা : লস্ট মডেস্টি
প্রচ্ছদ : শাহরিয়ার হোসাইন
পৃষ্ঠাসজ্জা : আসাদুল্লাহ আল গালিব

ষোলো ফেসবুক পেইজ
facebook.com/SholoMagazine

ষোলো ফেসবুক গ্রুপ
facebook.com/groups/sholo

লস্ট মডেস্টি
www.lostmodesty.com
facebook.com/lostmodesty

প্রকাশনা ও প্রাপ্তিস্থান:

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৪০৬ ৩০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক:
www.wafilife.com

নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# অন্দরমহল


৪ আমার ভূত দেখা!

১০ অমীমাংসিত রহস্য সিরিজ (১ম পর্ব)

১২ ২৩ বছর হবার আগেই জেনে নাও

১৩ পিঁপড়া ঢাকা লাশ

১৯ তুমি কি অদৃশ্য হতে চাও?

২২ ফেলটুস থেকে টপার! (১ম পর্ব)

২৭ ক্ষমা

২৯ আমাদের নায়কেরা (৩য় পর্ব): দুদু মিয়া

৩৫ উত্তরের অপেক্ষায়...

৩৭ ছড়া : মা পাখি ও ছোট্ট খোকা

৩৮ ব্যায়াম সিরিজ (১ম পর্ব) : দড়ি লাফ

৪০ কাক

৪২ জীবনে ফোকাস ঠিক রাখা খুবই জরুরি!

৪৩ বাটার ফ্লাই পি!

৪৪ সেন্টমার্টিনের অজানা ইতিহাস (১ম পর্ব)

৪৭ এ যেন পৃথিবীর বুকেই জান্নাত!

৪৯ মুখচোরা (২য় পর্ব)

৫৫ মদের বার থেকে মদীনায়!

৫৭ দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়? (২য় পর্ব)

৫৯ টাইগার ফিশ

৬৩ ছড়া : আর হেলা নয়

৬৪ কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করব? (৩য় পর্ব)

৬৯ কমিকস

৭০ রহস্যজট

৭১ অতীত শত্রুর কাফফারা (১ম পর্ব)

৭৪ ডেঙ্গু জ্বর : লক্ষণ ও করণীয়

৭৬ এই অবেলায়...

৮০ ধাঁধা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# মুখবন্ধ

প্রিয় ভাইয়া ও আপু,

বারবার যে কথাটা বলি, আবারও বলি। তোমাদের এই বয়সটা অনেক অদ্ভুত। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার এই ধাপটাতে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ—সবাই কেন জানি একটু দূরে সরিয়ে দেয়। কেউই যেন তোমাদের কথা, তোমাদের আবেগ-অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, প্রশ্ন, সংগ্রাম বুঝতে পারে না। অনেকেই জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজেকে অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত মনে করে।

তোমাদের দুঃখ কষ্টগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি। বড় ভাই হয়ে বন্ধুর এই পথে, নির্মম হয়ে ওঠা এই পথচলায় তোমাদের সঙ্গী হয়ে থাকতে চাই। আমরা যে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি, যে বুক চাপা কষ্ট, দলাবাধা কান্না লুকিয়ে রেখেছি বালিশে, বাথরুমের বদ্ধ দেয়ালে, সেই একই অভিজ্ঞতা যেন তোমাদের না হয় সেজন্যই আমাদের সকল প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশ হিসেবে ষোলো'র পঞ্চম সংখ্যা এখন তোমাদের হাতে।

এবারের সংখ্যায় রয়েছে প্রেম করতে না পারার আফসোস থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে 'উত্তরের অপেক্ষায়...', বয়ঃসন্ধিকালীন অমূলক নানা ভয় ও উদ্বেগ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে মুখচোরা সিরিজ, (ফাঁকিবাজদের জন্য) স্মার্টভাবে পড়াশোনার পদ্ধতি নিয়ে ফেলটুস থেকে টপার সিরিজ। দ্রুত বিয়ে করার জন্য সাবলম্বী হওয়ার টোটকা নিয়ে রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সিরিজ। ২৩ বছর হবার পূর্বেই যে বিষয়গুলো জানলে পরে আর আফসোস করতে হবে না, তার জন্য রয়েছে চমৎকার আলোচনা। এছাড়া ব্যায়াম সিরিজ, রেসিপি, রহস্য গল্প, রম্যগল্প, বাংলার ইতিহাস, কমিকস, রহস্যজট ও ধাঁধা ইত্যাদি ধারাবাহিক আয়োজন তো রয়েছেই।

আমরা চাই, ষোলো ছড়িয়ে পড়ুক তোমাদের সকলের মাঝে। তাই তো বাজারে হার্ডকপি থাকার পরেও নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হবার সময় পূর্বের সংখ্যার পিডিএফ উন্মুক্ত করে দিই। ম্যাগাজিনের দাম কমানোর সর্বোচ্চ চেষ্টাও করেছি আমরা। সন্দীপন প্রকাশনও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, দুর্মূল্যের এ বাজারে তা করা সম্ভব হয়নি। উল্টো কাগজের দাম বেড়ে যাওয়া, বিজ্ঞাপন বা স্পন্সরের অভাব ও আনুষঙ্গিক নানা খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা ম্যাগাজিনের দাম ১০ টাকা বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। এজন্য আমরা তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমরা যদি সবার মাঝে ষোলো ছড়িয়ে দাও তাহলে ইনশাআল্লাহ দাম কমানো সম্ভব হবে।

আগের সংখ্যাগুলোর পিডিএফ পেতে ভিজিট করো

https://tinyurl.com/SholoPdf

অথবা QR কোডটি স্ক্যান করো

ষোলোকে ছড়িয়ে দাও বাংলার আনাচে-কানাচে। ভালোবাসা নাও, হারিয়ে যেয়ো না।

ইতি,

তোমাদের খুব কাছের

লস্ট মডেস্টি টিম

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

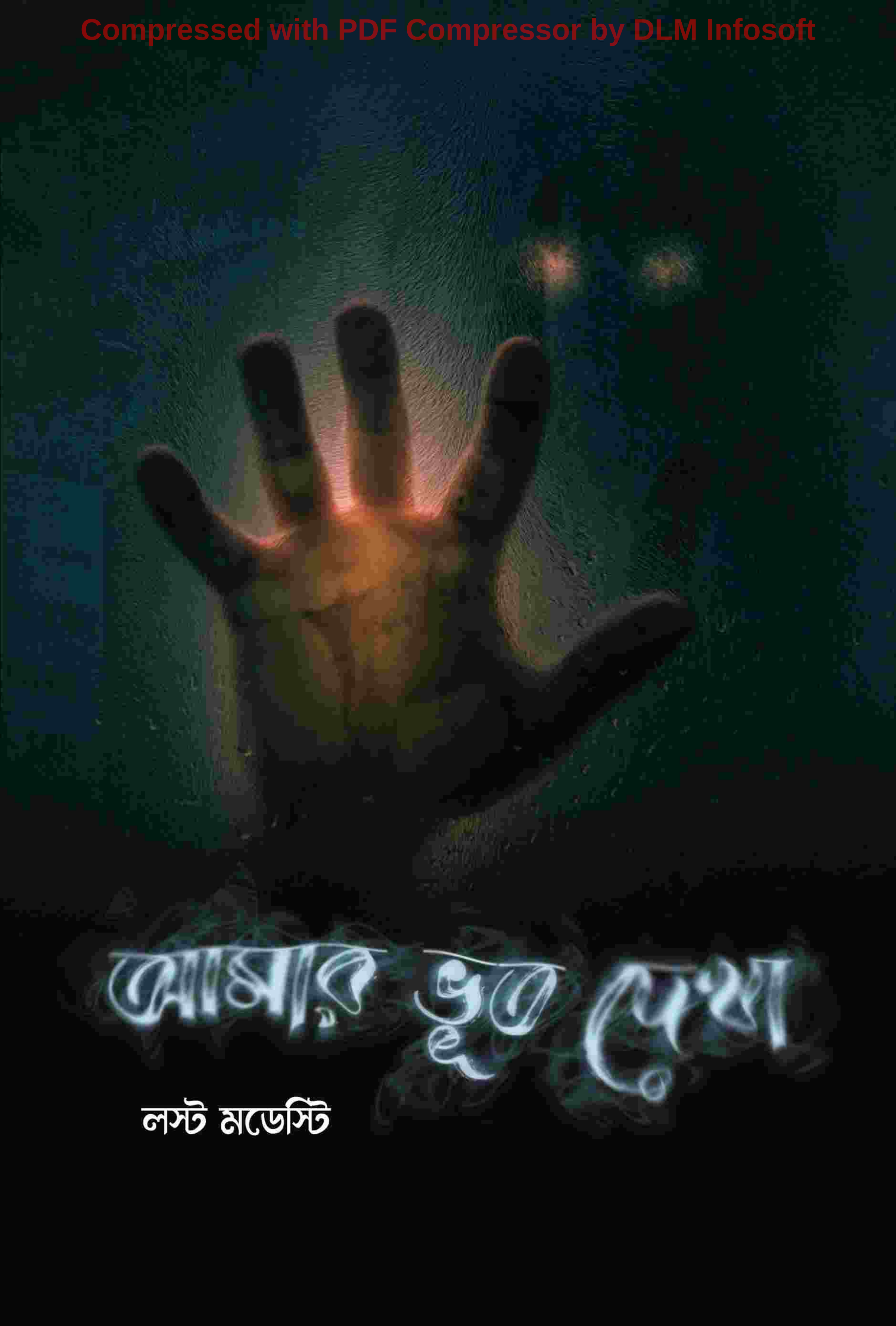

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**এক.**

আমি কিন্তু বেশ সাহসী। সাহসী বলতে ভীষণ সাহসী। একেবারে কুছ পরোয়া নেহী টাইপের অবস্থা। ওদিকে আমার ছোট ভাইবোনগুলো খুবই ভীতু। ভীতু হলে কী হবে, ওরা ভূতের গল্প শুনতে খুব পছন্দ করে। সারাদিন আমার কাছে এসে ভূতের গল্প শোনার আবদার করে। বিভিন্ন ভূতের গল্পের বই থেকে আমি ওদের গল্প পড়ে শোনাই। মাঝে মাঝে নিজেও মনের মাধুরী মিশিয়ে গল্প বানিয়ে বলি। মামদো ভূত, গলাকাটি ভূত, শাকচুন্নি, ডাকিনী, মেছো ভূত আরও কত কিছু।

সেদিন বুঝলি শুক্রবার দুপুরবেলা, জুম্মার নামাজ পড়ে আসছি আমি। বারান্দায় আব্বু মোটরসাইকেল রাখে, জানিসই তো। মোটরসাইকেলের ওপর দেখি সাদা কাফন পরা একটা লোক বসে আছে। আমি কাছে যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল!

**ঐদিন রাতে আমি আর ইমরান ভাই এশার নামাজ পড়ে ফিরছি। সবুজদের কবরবাড়ির ঐখানে বিশাল একটা শিমুল গাছ আছে, দেখেছিস না? ওই গাছে দেখি ইয়া লম্বা একটা জিন পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। পা দুটো বাঁশের মতো লম্বা। মাটিতে ঠেকে আছে। হাত বাড়িয়ে আমাদের ধরতে চাইল! আরে না! গুল মারছি না। বিশ্বাস না হলে ইমরান ভাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।**

ইমরান ভাই আমাদের কাজিনদের মধ্যে সবার বড়। উনার ছেলেই আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়! ইমরান ভাই খুবই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আমাদের সবাইকে কড়া শাসনে রাখে। কাজেই ওরা যে ইমরান ভাইকে জিজ্ঞাসা করবে না, এটা আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম। এ কারণেই এমন গুলপট্টি ওরা ধরতে পারত না।

আরে জানিস, গতরাতে কি হয়েছে? রাত তখন দুইটা। আমি বাথরুমে গিয়েছি। বাথরুম সেরে বেসিনে হাত ধুচ্ছি। হঠাৎ চোখ পড়ল আয়নার ওপর। আয়নায় আমার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার একটা মানুষকে দেখা যাচ্ছে!

ভয়ে গুটিশুটি মেরে গল্প শুনছিল ওরা। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল মৌরি (৮ বছর বয়স)- ‘ভাইয়া, তুই তখন কী করলি? তোর ভয় লাগল না?’

‘আরে ধুর! কীসের ভয়। জিন-ভূতে আমার আবার ভয় আছে নাকি!’- তাচ্ছিল্লের স্বরে বললাম আমি।

আয়না থেকে চোখ না সরিয়েই হুমকি দিলাম- ধর শালারে, আজকে তোরে কুরবানি দিব। সঙ্গে সঙ্গে আয়নার ভেতরের জিন গায়েব!

চৈত্র মাসের ভরদুপুরে বা লোডশেডিংময় ঝড়-বৃষ্টির রাতে এসব গল্প বেশি জমে। মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে ভয়ও দেখাই। হয়তো ছোট বোন নুহা (১০ বছর বয়স) সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসেছে। টেবিলের পাশে খোলা জানালা। আমি তার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি কোনো একটা কারণে। হঠাৎ থেমে চোখে-মুখে আতঙ্ক নিয়ে এসে ওকে বললাম, ‘নুহা দেখ দেখ, ওই জানালা দিয়ে একটা কঙ্কাল হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে!’ সে জানালার পাশে না তাকিয়ে ভ্যা করে কেঁদে দেয় ভয়ে। আমি হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি।

আবার ধরো, গ্রীষ্মের একেবারে আগুনঝরা দুপুর। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আমরা সবাই বাড়ি আছি। আমার ঘরের পাশেই চাচ্চুদের আম-কাঠাল-লিচুর বাগান। বাড়ির বড়রা সবাই ঘুমাচ্ছে। আমাদের চোখে তো আর ঘুম আসে না। বাগানে গিয়ে আম কুড়াই, লিচু খাই, গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে বানরের মতো লম্ফঝম্প করি। সবার ছোট যে রবিন, সে গাছে উঠতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারে না। আমরা ভাইবোনেরা হয়তো সবাই গাছের ওপরে। সে নিচে। মাঝে মাঝে আমাদের মনে দয়া হলে একটা আম বা লিচু নিচে ফেলছি। ও খাচ্ছে।

হঠাৎ আমি পিলে চমকানো চিৎকার দিয়ে বলি- ‘এই রবিন, জলদি গাছে ওঠ। তোর পেছনে একটা গলাকাট্টি ভূত দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষুনি তোর গলা কেটে নেবে।’

ও ভয়ে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে!

**ইয়ে মানে... একটা সত্য কথা বলি। প্রথমে নিজেকে যে খুব সাহসী হিসেবে দাবি করলাম, আমি কিন্তু আসলে তেমন সাহসী না। হাজার হোক, আমি তো ওদেরই ভাই। নুহা, মৌরি, রবিনকে ভয় দেখাতে ভালো লাগে সত্য। কিন্তু রাতে আমারও ভীষণ ভয় লাগে। রাতে বাথরুমের দরজা খোলা না রেখে বাথরুম করতে পারি না। অনেক রাতে ভয়ে তো বাথরুমেই যেতে পারি না। টয়লেট চেপে শুয়ে থাকি।**

এক রাতে চাপ সামলাতে না পেরে ভাবলাম খালি কোকের বোতলে কাজ সারি। কিন্তু কাজ শুরু করার পর ঘটে গেল সর্বনাশ। হাফলিটার কোকের বোতল ভরে গেল, কিন্তু আমার হিসু আর থামে না। বোতল উপচিয়ে পড়ে আমার হাত, ঘরের মেঝে সব ভরে গেল! কী এক বিশ্রী অবস্থা!

ধুর! গোপন কথা সবই বলে ফেললাম। তোমরা আবার কাউকে কিছু বোলো না কিন্তু। তাহলে আমার মান সম্মান কিছুই থাকবে না। ইমরান ভাইয়ের ছেলে প্রান্ত চাচ্চু বলেছে এটা জানাজানি হলে আমার নাকি আর কোনোদিন বিয়ে হবে না!

## দুই.

বৈশাখ মাসের বিকাল। মাসজিদের মাঠে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। চারিদিকে উৎসব উৎসব ভাব। দূর-দুরান্ত থেকে মানুষজন এসেছে। আমাদের বাড়িও আত্মীয়স্বজনে ভরে গিয়েছে। খালাতো ভাই শামীম, তানজিল, সোহাগ, মুনতাসির, ফুপাতো ভাই ওমর, গালিব, নাহিদ, শাহরিয়ার সবাই এসেছে। সেই হইহুল্লোড় করছি সবাই মিলে। দুপুরে হাঁসের মাংস আর চালের আটার রুটি দিয়ে জম্পেশ একটা খাওয়া দিয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম ওয়াজের মাঠের উদ্দেশে।

নাহিদ ভাই নতুন চাকরি পেয়েছে। নতুন চাকরির টাকায় প্রাণভরে আমরা জিলাপি, মিষ্টি, সন্দেশ, পিয়াজি, বেগুনি খেলাম সারা বিকেল ধরে। মাগরিবের নামাজের পর শুরু হলো ওয়াজ। আমরা ছিলাম একেবারে পেছনে... মাদুরে বসে। ওয়াজ শোনা আর কীসের কী, এ ওরে চিমটি কাটছে, এ ওর মাথায় গাট্টি মারছে, নিচু স্বরে কেউ কিছু বলছে আর তা শুনে হাসির রোল পড়ছে... এভাবেই আমাদের সময় পার হচ্ছে। আমার চোখ অবশ্য বারবার চলে যাচ্ছিল মাঠের একপাশের পুকুরের ধারের আমগাছটার নিচে। সেখানে বিশাল বিশাল ডেকচিতে মেজবানি রান্না হচ্ছে! না চাইতেও কেন জানি জিহ্বায় শুধু পানি চলে আসছে। ওয়াজ শেষ হলে সবাইকে খেতে দিবে। আজকে যত রাতই হোক মেজবানি খেয়ে যেতে হবে- সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

এশার নামাজের পর জোর হাওয়া বইতে শুরু করল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দুই এক ফোটা করে বৃষ্টিও পড়ছে। প্রান্ত চাচ্চু বলল- ‘চলো সবাই, বাড়িতে যাই। তুমুল বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। বাসায় যাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে পরে।’

রবিন এদিকে গালিব ভাইয়ের কাঁধে ঘুমিয়ে পড়েছে। সবাই চলে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। থাকবই। ওরা আমাকে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেক জোরাজোরি করল। অনেক বোঝাল। কিন্তু আমার এক কথা- আমি থাকবই। ওয়াজ শুনে তবেই বাসায় ফিরব।

ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কায় ওদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই চলে গেল ময়দান থেকে। আমি থেকে গেলাম। অল্প কয়েকজন মানুষ আছে কেবল। আমার খুশি তো আর ধরে না। মেজবানি রান্না এরইমধ্যে শেষ। একজন পাঁচজনের খাবার পাবে আজকে।

প্রান্ত চাচ্চুরা চলে যাবার দশ মিনিটের মাথায় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। ওয়াজের প্যান্ডেল কোথায়, শামিয়ানা কোথায়, মাদুর কোথায় তার আর কোনো ঠিক ঠিকানা থাকল না। যে যেভাবে পারে পড়িমরি করে মাসজিদের ভেতরে আশ্রয় নিল। আমাদের মাসজিদটা বিশাল। অনেক লোক ধরে। কাজেই ভেতরে কোনো সমস্যা হলো না। সবাই একটু ধাতস্থ হবার পর মাসজিদের ভেতরেই ওয়াজ শুরু হলো।

সবার মধ্যেই একটু দ্রুত ওয়াজ শেষ করার লক্ষণ দেখলাম। আমন্ত্রিত বক্তারা তাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছেন। আমিও মনে মনে খুশি হচ্ছি। তাড়াতাড়ি মেজবানী খাওয়া যাবে এখন। শেষ বক্তার আগের বক্তা ওয়াজ করছেন। এমন সময় আমার পেটের মধ্যে একটা চক্কর দিয়ে উঠল। একটু পর আবার। ঢেকুর উঠল পরপর কয়েকটা। ঢেকুরের পঁচা গন্ধে বুঝতে পারলাম দুপুরের হাঁসের মাংস আর চালের আটার রুটি হজম হয়নি। একটু পর টয়লেটের ভীষণ প্রেসার আসলো। বাইরে অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির রাত। ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেছে। মাসজিদের টয়লেট মাসজিদের মূল ভবন থেকে একটু দূরে। এরমধ্যে একা একা কীভাবে টয়লেটে যাব? আশেপাশে তাকালাম, পরিচিত কেউ নেই। প্রেসার চেপে রাখাও যাচ্ছে না। মাসজিদ ভরিয়ে ফেলার মতো অবস্থা। মানসম্মান একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। তাই বাধ্য হয়ে টয়লেটে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বৃষ্টিতে ভিজেই টয়লেটে যেতে হবে। মাসজিদ থেকে বের হয়ে দশ ধাপ ফেলেছি এমন সময় সর্বনাশা কাণ্ড ঘটে গেল। কৌতূহলের চাপ সামলাতে না পেরে হাগু মহাশয় পেট থেকে পৃথিবীতে বের হয়ে আসলেন! এমন অবস্থায় মাসজিদে তো আর ফিরে যাওয়া যাবে না। খুব মন খারাপ হলো। আহারে! আমার আর মেজবান খাওয়া হবে না। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা মনে হতে ভয়ে আতঙ্কে পুরো শরীর কাঁপতে লাগল। রাত বাজে বারোটা। এই অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির রাতে আমি একা একা বাসায় যাব কীভাবে? সঙ্গে ফোনও নেই।

**মৌরি, নুহা, রবিনদের যত ভূতের গল্প শুনিয়েছি সব একে একে মনে হতে থাকল। হাত-পা কাঁপাকাপির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। এখন উপায়? হাজার ভেবেও কোনো কূলকিনারা পেলাম না। শেষমেষ সিদ্ধান্ত নিলাম, যে করেই হোক যেতে হবে। এক হাতে স্যান্ডেল নিলাম, প্যান্ট গুটিয়ে নিলাম হাঁটু পর্যন্ত। হাগু মহাশয় প্যান্টের ভেতরে বিচরণ করার ফলে বেশ অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু কী আর করার!**

বিসমিল্লাহ বলে যত দুআ-দরুদ-সূরা জানি সব জোরে জোরে পড়তে পড়তে দৌড় দিলাম। তুমুল বৃষ্টি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, বাজ পড়ছে, গলাকাটি, মামদো, ডাকিনী, শাকচুন্নি সব ভূতের কথা মনে পড়ছে। বিভীষিকাময় এক পরিস্থিতি। এর মধ্য দিয়েই আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির একেবারে কাছাকাছি চলে আসলাম। সুমনদের বাড়ি পার হলেই আমাদের বাড়ির সীমানা শুরু হবে। এমন সময় স্বশব্দে বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় আমি যা দেখলাম তাতে ভয়ে মরে যাবার অবস্থা। সুমনদের বাড়ির বারান্দায় সারিবেধে ১০/১২ টা সাদা কাফন পরা ভূত দাঁড়িয়ে আছে।

mpressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ গো বাঁচাও আমাকে! ওরে আল্লাহ, ও আল্লাহ, মেরে ফেলবে এরা আমাকে... এমন চিৎকার দিতে দিতে আমি কখন যে বাড়িতে এসে পৌঁছালাম, কখন দরজায় পাগলের মতো ধাক্কাধাক্কির ফলে আব্বু দরজা খুলে দিল, কখন আমি উঠোনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম তার কিছুই মনে নেই!

## তিন.

আমার হুশ ফিরল পরের দিন সকাল দশটায়। খাবার ঘরে সবাই উচ্চস্বরে হাসাহাসি করছে। ঘুরে ফিরে আমার নাম আসছে। আমাকে নিয়ে সবাই মজা করছে কেন? ব্যাপার কী?

তৎক্ষণাৎ আমার গতরাতের ঘটনা সব মনে পড়ে গেল। সবার ওপর খুব রাগ হলো। আমি ভূতের গ্যাংয়ের খপ্পর থেকে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। আর সবাই আমাকে নিয়ে এমন মজা করছে! প্রচণ্ড ক্রোধে বিছানা খামচে ধরে পড়ে রইলাম। কতক্ষণ পড়ে রইলাম জানি না। প্রান্ত চাচ্চুর কণ্ঠে সচকিত হলাম। হাসিহাসি মুখে বলল -কী ভাতিজা! ঘুম তাহলে ভাঙল তোমার!

প্রান্ত চাচ্চুর কথা শুনে মৌরি, নুহা, রবিন, শাহরিয়ার... সবাই দৌড় দিয়ে ঘরে আসলো।

ভাইয়া, তুমি নাকি অনেক সাহসী! তাহলে ভূত দেখে প্যান্ট ভরে হেগে দিয়েছিলে কেন?- রবিন নিষ্পাপ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করাতে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আমি লাফ দিয়ে উঠে ওকে মারতে গেলাম। কিন্তু ও এরই মধ্যে ইমরান ভাইয়ের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছে। সদা গম্ভীর ইমরান ভাই পর্যন্ত হাসছে।

আর সহ্য করতে পারলাম না। প্রচণ্ড ক্রোধে বিস্ফোরিত হয়ে আমি বললাম- তোমরা সবাই আমাকে নিয়ে মজা করছ! অথচ আমি কাল রাতে কী ভয়ংকর বিপদে পড়েছিলাম। সুমনদের উঠানের ১০/১২ টা ভূত আমার ঘাড় মটকে দিতে আসছিল!

'কচু ভূত! ঐগুলো সব সারের বস্তা!' মুখ ভেংচিয়ে বলল নুহা।

আমি ওর চুলের বেনী ধরে জোরে টান দিলাম – আমার জায়গায় থাকলে বুঝতি, ওগুলো সারের বস্তা না ভূত!

ব্যাথা পেয়ে চিৎকার করে উঠল সে। মৌরি ওকে সমর্থন দিয়ে বলল- না ভাইয়া, ও ঠিকই বলেছে। ওগুলো আসলেই সারের বস্তা ছিল। ভূত না। ইমরান ভাই নিজের চোখে দেখে এসেছে!

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কী বলছে সবাই! সারের বস্তা!

সোহাগ ভাই এতক্ষণ হাসিমুখে আমাদের সবার কথা শুনছিল। এবার সে মুখ খুলল-

শোন, তুই গতরাতে 'সুমনদের উঠানের সাদা কাফন পড়া ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, ও আল্লাহ বাঁচাও আমাকে' ইত্যাদি বলতে বলতে উঠানে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়িস। আমরা সবাই তো প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। ইমরান ভাই তৎক্ষণাৎ ওমর আর গালিবকে নিয়ে বেরিয়ে যায় সুমনদের উঠানে। কারা তোকে মারতে চায় দেখার জন্য।

আম্মা, ফুপি, খালা সবাই কান্নাকাটি শুরু করেছে। তোর আব্বা মানে খালু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। আমরা পানির ঝাপটা দিয়ে বহুকষ্টে তোর জ্ঞান ফেরাই। জ্ঞান ফিরে তুই বারবার বলতে থাকিস সুমনদের উঠানের ভূতগুলো আমাকে মেরে ফেলবে, ওরা আমাকে তাড়া করেছে। আর তোর গায়ের সে কী কাঁপুনি।

তোর ভেজা জামাকাপড় খুলে শুকনো জামাকাপড় পরিয়ে ২/৩ টা কাথা চাপানোর কথা বললেন বড় খালু। আমরা প্যান্ট খুলে আবিষ্কার করলাম তুই ভয়ে টয়লেট করে ফেলেছিস।

দুহাত তুলে সোহাগ ভাইকে বাধা দিলাম আমি- আরে না ভাই, আমি ভূতের ভয়ে টয়লেট

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করিনি। বিশ্বাস করেন, ভাই। দুপুরের হাঁসের মাংস বেশি খাওয়ার কারণে আমার পেট খারাপ হয়ে যায়। মসজিদের টয়লেটে যাবার সময় চাপ আর ধরে রাখতে পারিনি। তখনই আমার প্যান্ট নষ্ট হয়ে যায়।

কেউই আমার কথা বিশ্বাস করল না। সবাই মুখে ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সোহাগ ভাই আবার বলা শুরু করল- চাপাবাজি করিস না। তোর চাপাবাজির দিন শেষ। তোর গায়ে ২/৩ টা কাথা চাপানো শেষ হতেই হাসতে হাসতে হাজির হলো ইমরান ভাইয়েরা। কী হয়েছে জানতে চাইলেন খালু। ইমরান ভাইয়েরা তো হাসির চোটে কথাই বলতে পারেন না এমন অবস্থা। শেষমেষ বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে গালিব বলল- মামা, আর বইলেন না। সুমনদের বাড়ির বাইরের বারান্দায় ১০/১২ টা সাদা সারের বস্তা রাখা ছিল। ও তো এমনিই খুব ভীতু। এর ওপর ঝড়বৃষ্টির রাত। ওগুলোকেই ভূত মনে করে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে!

আমি সবাইকে বলতে গেলে প্রায় পা ধরে অনুরোধ করলাম গতরাতের ঘটনা যেন কারও সঙ্গে শেয়ার না করে। সবাই রাজি হলো। কিন্তু কয়দিন না যেতেই দেখি এলাকার প্রায় সবাই জেনে ফেলেছে। আমার আর মুখ দেখানোর উপায় রইল না। সবাই আমাকে পঁচাতে লাগল।

তবে সবচেয়ে আঘাত পেলাম প্রান্ত চাচ্চুর কথায়। প্রান্ত চাচ্চু গ্যারান্টি দিয়ে বলেছে- আমার নাকি কোনোদিন বিয়ে হবে না। এমন ভীতু ছেলের সাথে কেউ মেয়ে বিয়ে দেবে না!

তবে সেদিন ভূত দেখতে না পেলেও সত্যিকারের ভূত মানে জিন আসলেই দেখেছিলাম এরপর। বেশ কয়েকবার। সেই গল্প আজ আর নয়। অন্য আরেকদিনের জন্য তোলা থাক।

না, গুল মারছি না। সত্যিই দেখেছি কিন্তু!

***

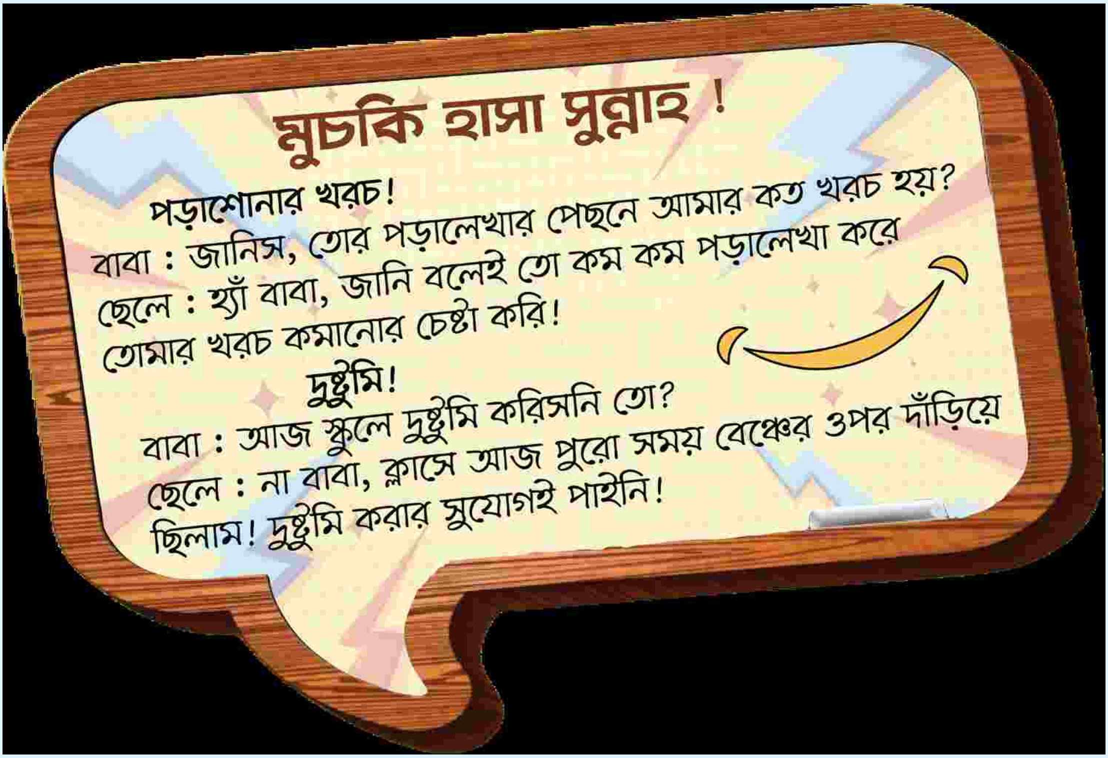

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অমীমাংসিত রহস্য সিরিজ-১

# সৈকতে পাওয়া লাশের মৃত্যুরহস্যের জট খোলেনি ৭৫ বছরেও

আব্দুল্লাহ আল ফেরদৌস

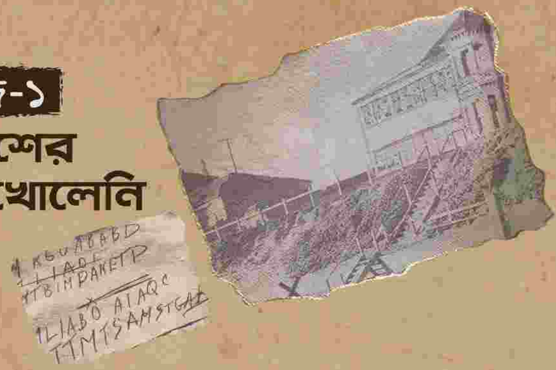

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর। এক তারিখ সকাল।

অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইডে সমারটন সৈকতে এক ভদ্রলোকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। একদম অক্ষত একটি মৃতদেহ, আঘাতের চিহ্নমাত্র নেই। লোকটি একেবারেই পরিপাটি সুবেশী, কিন্তু তার কোনো কাপড়েই লেবেল লাগানো নেই। পকেটে ছিল হেনলি বিচে যাওয়ার একটি অব্যবহৃত ট্রেন টিকেট।

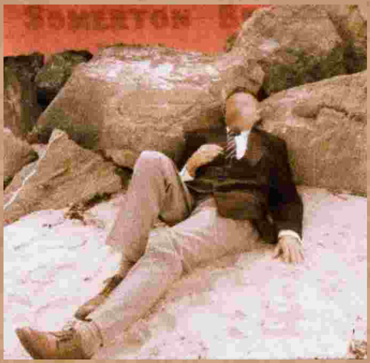


*জিএম ফেল্টুর বইয়ের প্রচ্ছদে তামাম শুদ কেইসের ছবি*

তার প্রায় এক মাস পর এডিলেইড রেলস্টেশনে একটি মালিকবিহীন স্যুটকেস পাওয়া গেল। স্যুটকেসটিতে এবং এর ভেতরে থাকা কাপড়গুলোতেও কোনো লেবেল নেই। এটার ভেতরে রয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস- স্ক্রু ড্রাইভার, দড়ি, ছুরি, কাচি ইত্যাদি।

*স্যুটকেস এবং এর ভেতরে পাওয়া ছুরি-কাচির ছবি*

পুলিশ ভেবেছিল এই স্যুটকেস থেকে তারা খুনের বেশ কিছু ক্লু পাবে। কিন্তু হতাশ হতে হয় তাদেরকে। স্যুটকেস থেকে বিশেষ কোনো ক্লু পাওয়া গেল না। আবার লাশের ময়নাতদন্ত করেও শরীরে বিষক্রিয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তদন্তকারীদের অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাবার মতো অবস্থা। কিন্তু এরপর হুট করে আবিষ্কৃত হলো একটি বিষয় যা ঘুরিয়ে দিল তদন্তের মোড়।

লোকটির প্যান্টের ভেতরের গোপন পকেটে পাওয়া গেল কোনো বই থেকে ছেড়া এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা- তামাম শুদ!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

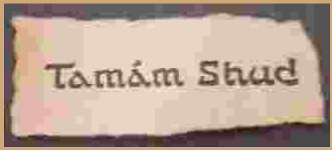


*কাগজের টুকরোতে লেখা তামাম শুদের নাম*

কথাটির অর্থ কী? জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের শরণাপন্ন হলো পুলিশ। তারা জানাল এর অর্থ সমাপ্তি বা শেষ। এই কথাটি রয়েছে রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম কবিতা সংকলন বইতে। কোন বইটি থেকে সেই কাগজের টুকরোটি ছেঁড়া হয়েছে তা বের করার জন্য পুলিশ ব্যাপক আকারে সার্চ অপারেশন শুরু করল।

এক ব্যক্তি যোগাযোগ করল পুলিশের সঙ্গে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে জানাল- আমার গাড়ির পেছনের সিটে কেউ একজন রেখে গিয়েছে এই বইটা।

কবে? ঠিক মনে আছে আপনার সেদিন কয় তারিখ ছিল?

ঠিক মনে নেই। তবে লাশ পাবার দুই বা এক সপ্তাহ আগে হবে হয়তো। না, মৃতব্যক্তির সাথে আমার কোনো পরিচয় নেই। তাকে জীবনেও দেখিনি।

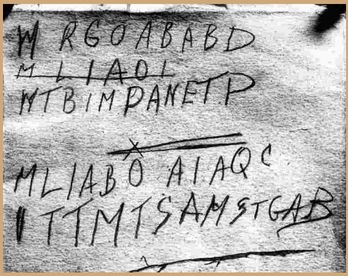


*বইয়ের পেছনের পাতায় দাগাদাগির ছবি*

পুলিশ দ্রুত বইটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। বইয়ের পেছনের পাতায় কিছু অদ্ভুত দাগাদাগি করা ছিল। তদন্তকারীরা যাকে সাংকেতিক বার্তা মনে করে। আর ছিল একটা ফোন নম্বর। ফোন করা হলো সেই নম্বরে। অপর প্রান্ত থেকে জানানো হলো- আমি একজন নার্স। আমার নাম জেসিকা। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়ামের বইটির একটি কপি আলফ্রেড বক্সালকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলাম।

আলফ্রেড কী করে?

ও আর্মি অফিসার। কী যে এক বিপদে পড়লাম। আমার নম্বর কেন ওই বইতে লেখা! আমি ওকে বাপের জন্মেও দেখিনি।

পুলিশ ধরে নিলো মৃত লোকটা মনে হয় আলফ্রেড বক্সাল। মৃত্যুরহস্যের কূল কিনারা বোধহয় এবার হবে। কিন্তু তিন দিনের মাথায় তারা খুঁজে পেল জীবিত আলফ্রেড বক্সালকে। তাহলে আলফ্রেড বক্সালই কি খুনি? কারণ, তার বই থেকেই ছেড়া পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে স্যুটকেইসে।

পুলিশদের হতবাক করে দিয়ে আলফ্রেড জেসিকার উপহার দেওয়া সেই বইটি বের করে দেখাল। বইয়ের সবপৃষ্ঠা অক্ষত। শেষ পৃষ্ঠায়, জেসিকা যেমন জানিয়েছিল, জেসিকার নাম লেখা আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা আলফ্রেডের রুবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম আর গাড়ির ব্যাকসিটে খুঁজে পাওয়া রুবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়ামের সংস্করণ আলাদা।

**অনেকেই বলে নার্স জেসিকাই খুনি। অনেকেই দাবি করে- এটি আত্মহত্যা। কারণ বইটির মূল উপজীব্য ছিল- মৃত্যুর সময় অনুতাপ না রাখা। আবার কেউ মনে করে সেই লোকটি ছিল কোনো গুপ্তচর।**

এই রহস্যের আর কোনো সমাধান হয়নি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তামাম শুদের এই অমীমাংসিত রহস্য সমাধানের চেষ্টা সম্প্রতি শুরু হয়েছে। তবে আদৌই মৃত্যুরহস্যের সমাধান হবে কি না কে জানে!

লাশ আবিষ্কারের প্রায় সাড়ে ৭ মাসের মাথায় ১৪ জুন, ১৯৪৯ সালে কবর দেওয়া হলো লোকটিকে। সমাধির ফলকে লেখা হয়- **এখানে শায়িত আছেন সমারটন সৈকতে ১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে পাওয়া এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি!**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ২৩ বছর হবার আগেই জেনে নাও

মাঝি মাল্লার দল

**১ — রোজগার**

তোমার ভবিষ্যতের ৯ - ৫ টার চাকরি অন্য কারও প্যাসিভ ইনকামের উৎস। অর্থ উপার্জনের নতুন নতুন পন্থার খোজ করো। নিজের আয়ের উৎস তৈরি করো।

**২ — পর্ন**

অশ্লীল ভিডিও তোমার সফলতাকে গলা টিপে মারে। এগুলো তোমার মস্তিষ্ককে শুধু স্থবির করে না, রীতিমতো ধ্বংস করে দেবে।

**৩ — দায়িত্ব**

তোমার সমস্যার সমাধান অন্য কেউ করে দেবে না। তোমার জীবনের দায়িত্ব বুঝে নাও।

**৪ — মাদক**

তোমার জীবনে গাজা, সিগারেটের উপকারিতা শূন্য। এগুলো তোমার চিন্তাভাবনাকে স্থবির করে দেবে। ফোকাস কমিয়ে তোমাকে ব্যর্থ বানাবে।

**৫ — গোপনীয়তা**

মানুষকে ততটুকুই জানাও যতটুকু জরুরি। এর বেশি না। নিজের প্রাইভেসি ও গোপনীয়তাকে সম্মান করো।

**৬ — আরামপ্রিয় হব না**

আরাম-আয়েশ ও অলসতা নিকৃষ্ট আসক্তি, হতাশার দুনিয়ার খুব সস্তা টিকেট।

**৭ — প্রতিযোগী নয়, সহযোগী হও**

তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান কাউকে পেলে তার সাথে প্রতিযোগিতা করবে না, বরং সহযোগী হয়ে কাজ করো।

**৮ — অনুসরণ**

তুমি জীবনে যে পথে চলতে চাও, সেই পথের পথিকদের কাছ থেকে পরামর্শ নাও, অন্যদের কাছ থেকে নয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৌদি আরবের একজন প্রখ্যাত শাইখ আব্বাস আল বাত্তাউয়ী রহিমাহুল্লাহ। তিনি বেশ কয়েক বছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শাইখ আব্বাস স্বেচ্ছায় ভলান্টিয়ার ভিত্তিতে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে মৃত ব্যক্তিদের গোসল দিয়েছেন। কাজেই তিনি বিভিন্ন মানুষের মৃত্যু দেখেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। সেখান থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ আমরা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব।

একদিন শাইখ আব্বাসের কাছে এক ভদ্রলোক ফোন দিয়ে বললেন, 'আপনি কি আসতে পারবেন আমাদের এখানে? একজন ব্যক্তি মারা গেছে। মৃতদেহ গোসল দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই আমি আসছি।' এরপর শাইখ আব্বাস সেখানে গেলেন। গিয়ে দেখেন সেই বাড়িটি বিশাল। বিশাল বাড়ি বললেও ভুল হবে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি এটাকে কোনো দুর্গের সাথে তুলনা দেওয়া হয়। এত বিরাট বিত্তশালী ধনী একজন মানুষের বাড়ি থেকে উনার ডাক এসেছে। শাইখ আব্বাস বলেন, 'শুধু মেইন গেট থেকে বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে, এত আলিশান বাড়ি! তিনি বাড়ির ভেতরে গেলেন এবং ভেতরে গিয়ে আরও অবাক হয়ে গেলেন। চারিদিকে এত প্রাচুর্য, এত ধন-সম্পদের ছড়াছড়ি!

ভেতরে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই লোকটি শাইখকে বলল, 'সোজা ওপর দিকে যেতে থাকুন। ওপরে একটা সিঁড়ি আছে। এরপরে যে রুমটা আছে সেখানে যাবেন।'

শাইখ একজন সম্মানিত ব্যক্তি। এই বাড়িতে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। অথচ সেই লোকের কথাবার্তার মধ্যে ভদ্রতার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। খুবই কঠোরভাবে লোকটা কথা বলছিল। সাধারণত কাউকে যখন আমরা কোনো কাজে সহায়তার জন্য ডাকি, তিনি যখন আমাদের অনুরোধে আসেন তখন আমরা ন্যূনতম ভদ্রতা হলেও দেখাই, সালাম বিনিময় করি। কুশলাদি বিনিময় করি। কিন্তু লোকটা এই ধরনের কিছুই বলল না। এ ধরনের আচরণ দেখে শাইখ খুবই মর্মাহত হলেন।

'আপনি কি নিজে যেতে পারবেন নাকি আমাদের কোনো কাজের লোককে বলব আপনাকে নিয়ে যেতে?' শাইখকে সেই লোকটি আবার কঠোর ভাষায় প্রশ্ন করল। শাইখ নিজে থেকে এখানে আসেননি; বরং সেই লোকটি তাকে ফোন দিয়ে আসতে অনুরোধ করেছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ভদ্রতাটুকুর সাথে পথ এগিয়ে দেওয়ার কাজটুকুও সে করছে না। যাই হোক, শাইখ বললেন, 'দরকার নেই আমি নিজেই যেতে পারব।'

শাইখ সেই নির্ধারিত কক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি বলেন, 'সেই প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ির চারিদিকে সবকিছু এত পরিষ্কার ছিল যে, কোথাও একটা ময়লার চিহ্নমাত্র নেই। মেঝেতে তাকালে সত্যিকার অর্থেই নিজের চেহারার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল। সবকিছু চক চক ঝক ঝক করছে।'

শাইখ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেলেন। নির্দিষ্ট বেডরুমে গেলেন। বেডরুমটি ছিল বিশাল। সেখানে অনেক কাজের লোক দাঁড়িয়ে আছে। কমপক্ষে দুই থেকে তিনজন লোক বিভিন্ন কাজ করছে। কিন্তু মৃতব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্যকে সেখানে দেখা গেল না।

**শাইখ সরাসরি মৃতদেহের দিকে হেঁটে গেলেন। মৃতদেহটি একটা খাটিয়া বা টেবিলের ওপরে রাখা ছিল। কাপড় দিয়ে ঢাকা মৃত ব্যক্তিকে দেখার জন্য তিনি মুখের অংশ থেকে কাপড় উঠালেন। যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি দেখেন লাশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারাদেহে ছোট ছোট লাল পিঁপড়া দিয়ে ঢাকা।**

Compressed with PDF Com

এত পিঁপড়া যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন এটা পিঁপড়ার কোনো বাসা। যেন এটা কোনো লাশ নয়। সারা গায়ে পিঁপড়ারা হেঁটে বেড়াচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। লাশের নাক দিয়ে মুখ দিয়ে পিঁপড়া বের হচ্ছে আবার ঢুকছে। লাশের গোটা শরীরে পিপড়ারা কামড়াচ্ছে। যে ধরনের লাল পিঁপড়া কামড়ালে আমাদের শরীরে খুবই যন্ত্রণা হয় সেই ধরনের লাল পিঁপড়া দিয়ে লাশের সারা দেহ ছেয়ে গেছে।

শাইখ এত পিঁপড়া দেখে খুবই অবাক হলেন। এত পিঁপড়া কোত্থেকে আসলো? শাইখ আশেপাশে তাকিয়ে কোথাও কোনো ময়লা বা এই ধরনের কিছু দেখতে পেলেন না। আশেপাশে কোনো কিছু না দেখে শাইখ তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে আবার লোকটার চেহারা আগের মতো ঢেকে দিলেন। আর অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই মৃতদেহ গোসল দিবেন কীভাবে। তিনি সাহায্যের জন্য আরেকজন শাইখের কাছে ফোন দিলেন।

শাইখ আব্বাসের ঘটনা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এবং তিনি ফোনে বললেন, 'এরকম ঘটনা তো কখনো শুনিনি। ফিকহের কিতাবে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা আছে। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি আগুনে পুড়ে মারা যায় তার লাশ কীভাবে ধুতে হবে, কোনো ব্যক্তি যদি টুকরো টুকরো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়, সেই মৃতদেহ কীভাবে ধুতে হবে তার বর্ণনাও আছে। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রে কী করণীয় সে ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।' তাই সেই শাইখ বললেন, 'আপনি নিজে যা ভালো মনে করেন সেটাই করুন। আমার কাছে এর কোনো পরামর্শ নেই।'

শাইখ আব্বাস তখন আশেপাশে থাকা কাজের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন এই মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন ছেলে, ভাই, আত্মীয় কাউকে দেখছি না। ওরা কোথায়? ওরা সেই বাড়িতেই ছিল। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। যে লোকটা শাইখকে ফোন করে আসতে বলেছিল, সে ছিল ওই মৃত ব্যক্তির সন্তান। সেও সেখানে ছিল না। কাজেই পরিবারের লোকেদের কাছ থেকে জানার কোনো সুযোগ ছিল না এই মৃতব্যক্তির এই অবস্থা কীভাবে হলো। শাইখ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এখন কী করা যায়। অবশেষে খেয়াল করলেন, বেডরুমের পাশে একটা বাথরুম আছে। আগেই বলা হয়েছে, সেই বাড়ির সবকিছু খুবই আলিশান, সবখানে বিলাসিতার ছাপ। বাথরুমটাও ছিল বিশাল। বাথরুমে সুন্দর, বিরাট একটি বাথটাব আছে।

শাইখ কল ছেড়ে পুরো বাথটাবের চৌবাচ্চা পানি দিয়ে ভর্তি করলেন। এরপর কাজের লোকের সাহায্য নিয়ে মৃত দেহটাকে সেখানে চৌবাচ্চার মধ্যে ছেড়ে দিলেন। এর আগে সেই মৃতদেহের নাক-কানগুলো তুলা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। মৃতদেহটি পানিতে ডুবে গেল আর পিঁপড়াগুলো ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এভাবে কিছুক্ষণ রাখার পর সবগুলো পিঁপড়া পানির কারণে ভেসে চলে গেল। এই অবস্থায় তিনি সেই লাশটাকে গোসল দিলেন। শাইখ ভেবে পাচ্ছিলেন না যে, এত পরিষ্কার, কোথাও একটু ময়লা নেই, চারিদিকে সবকিছুই চকচকে ঝকঝকে। সেখানে এতগুলো লাল পিঁপড়া কোত্থেকে আসলো। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লাশের গোসল দেওয়া শেষ হলে কাফন দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেওয়া হলো।

শাইখ আব্বাস তার কাজ শেষ করে সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন। নিচে নামার সময় মৃত ব্যক্তির পরিবারের একজনের সাথে দেখা হলো। সে ছিল মৃত ব্যক্তির অন্য একজন ছেলে। এই লোকটাও তার ভাইয়ের মতোই শাইখের সাথে অভদ্র ব্যবহার করল। অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় শাইখকে বলল- ওখানে ড্রাইভারের রুম আছে। সেখানে গিয়ে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে নিন।

শাইখ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি লোকটার চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি এখানে খাওয়া-দাওয়া করতে আসিনি, টাকা-

ompressor by DLM Infosoft

পয়সার জন্যেও আসিনি। আমি এসেছি এই কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে সেই কারণে। ধর্মীয় দায়িত্ব থেকেই আমি এখানে এসেছি। আমার কাজ শেষ, আমি এখন যাচ্ছি।'

শাইখ পাঁচ মিনিট হেঁটে বাড়ির সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছালেন। তিনি দেখতে পেলেন, সে রাস্তায় আগে থেকেই একটা গাড়ি শাইখের জন্য অপেক্ষা করছে। যেই লোকটা শাইখকে ফোন দিয়েছিল, সে আগেই সেখানে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভেতরের ব্যবহারের কারণে শাইখ তাদের কোনো ধরনের সেবা বা সার্ভিস নিতে চাচ্ছিলেন না। শাইখ জানালেন, তিনি সেই গাড়িতে উঠবেন না। এমন সময় সেখানে ওই মৃত ব্যক্তির নাতি এসে উপস্থিত হলো। সে ছিল ১৮ বছর বয়সের একজন ছেলে। শাইখ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখে সে নিজেই সেখানে এসেছিল। এই ছেলেটা তার বাবা কিংবা চাচার মতো বেয়াদব নয়। বরং বেশ ভদ্র স্বভাবের ছিল। সে খুব বিনয়ের সাথে বাবা ও চাচার ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। ভদ্রতার সাথেই বলল, 'শাইখ, আপনি কষ্ট করে এসেছেন। আমি আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে গাড়িতে উঠুন।'

শাইখ, প্রথমে রাজি হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেটার অনুরোধে গাড়িতে উঠলেন। সেই মৃত ব্যক্তির নাতি গাড়ি চালাতে লাগল। আমরা আগেই বলেছি, শাইখ আব্বাস যখন কাউকে গোসল দিতেন তখন সেই মৃত ব্যক্তির জীবন, তার আমল ইত্যাদি ব্যাপারে জানতে চাইতেন। গাড়িতে বসে শাইখ আব্বাস ছেলেটির সাথে কথাবার্তা চালাতে থাকলেন। শাইখ ছেলেটিকে বললেন, 'আমি এমন একটি বিষয় দেখেছি সে ব্যাপারে তোমরা কি কিছু জানো?'

ছেলেটি বলল, 'আমরা সবাই জানি। বাড়ির সবাই জানে। দাদার লাশ থেকে লাল লাল পিঁপড়া বের হচ্ছিল। পুরো শরীর পিঁপড়ায় ভরে যায় এবং পিঁপড়াগুলো দাদাকে কামড়াতে থাকে। কিন্তু এগুলো কোত্থেকে এসেছে, কীভাবে এসেছে, এগুলো কীভাবে সরাবো সেটা আমরা জানি না। এই কারণে পরিবারের কেউ সেই লাশের পাশে দাঁড়ানোর সাহস করছিল না।'

তোমার দাদা বেঁচে থাকতে কী করতেন, একটু বলবে?

**ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল প্রশ্ন শুনে। এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শাইখ, আমার দাদা তার মায়ের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করত। এমনকি দাদা তার মাকে মারধর করত। পরিবারের কারও কথা শুনত না। যতভাবে আঘাত করা সম্ভব; হাত দিয়ে, পা দিয়ে, চড়-থাপ্পড় সবভাবেই আঘাত করত।'**

চিন্তা করতে পারো, একজন ব্যক্তি তার মায়ের সাথে এ ধরনের আচরণ করত! শাইখ সেই মৃত ব্যক্তির নাতির মুখ থেকে এ-কথা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। নাতি বলতে থাকল, 'শুধু তাই না। এমনভাবে মারধর করত যে, দাদার মায়ের গায়ে সেই আঘাতের কালচে দাগ পড়ে যেত। চোখের নিচে, চেহারায় মুখে হাতে-পায়ে দাগ বসে যেত। এ অবস্থা দেখে আমার আব্বা তার দাদীকে অর্থাৎ সে মৃত ব্যক্তির মাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেত। পুলিশ ইন্সপেক্টর দাদীর গায়ে আঘাতের চিহ্নগুলো দেখে জিজ্ঞাসা করত এগুলো কীসের আঘাত। কিন্তু তিনি কিছুই বলতেন না। কোনো অভিযোগ করতেন না। তিনি বলতেন- না, এমন কিছু না, এই সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছি। তার ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোনো রিপোর্ট করতেন না। দাদা, তার মাকে ঘনঘন মারধর করত। আমার বাবা, থানায় গিয়ে বারবার দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাত। পুলিশরাও সবকিছু বুঝতে পারত। কিন্তু যেহেতু দাদার মা নিজে থেকে থানায় কোনো অভিযোগ করতেন না, তাই পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিতে পারত না।'

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গাড়ি চলতে লাগল। জমাটবাঁধা নীরবতা নেমে এলো গাড়ির ভেতরে। কেউ কোনো কথা বলল না। শাইখ জানালা দিয়ে উদাস হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করার পরিণতি দুনিয়াতে থাকতেই ভোগ করতে হয়। সেই লোকটা যখন মারা যায় তখন মৃত্যুশয্যায় তার আশেপাশে কেউ ছিল না। তার ছেলে, নাতি কেউই তার পাশে এগিয়ে আসেনি। মৃত্যুর পরে যখন ছোট ছোট লাল পিঁপড়া দিয়ে লোকটার সারাদেহ ঢেকে যায় তখনো কেউ তার পাশে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। শেষ পর্যন্ত এভাবেই লোকটাকে দাফন করা হয় এবং তার কাফনের সময়, জানাজার সময়েও কোনো আত্মীয়স্বজন তার পাশে ছিল না।

যদি মৃত ব্যক্তির ওপর কোনো আঘাত করা হয়, তাহলে সে জীবিত ব্যক্তির মতোই ব্যথা অনুভব করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে জানিয়েছেন মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙে ফেলা, জীবিত ব্যক্তির হাড় ভেঙে ফেলার মতোই।[১] অর্থাৎ একই রকম ব্যথা তারা উভয়েই অনুভব করে। তাহলে এবারে সেই লোকটার কথা চিন্তা করো, যার গোটা দেহ লাল পিঁপড়া কামড়াচ্ছিল। নাকের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল এবং সারাদেহ কামড়াচ্ছিল। জীবিত ব্যক্তি যখন ব্যাথায় চিৎকার করে আমরা সেই চিৎকার শুনতে পাই। কিন্তু মৃতব্যক্তির চিৎকার শুনতে পাই না।

**আলিমরা বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাহলে এর শাস্তি এবং পরিণতি দুনিয়াতে থাকতেই সে ব্যক্তিকে ভোগ করতে হয়। আর আখিরাতের শাস্তি তো আছেই।**

বড়দেরকে সম্মান করা, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা, তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের খিদমত করা, সেবা-যত্ন করা এই বিষয়গুলো ধীরে ধীরে সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে। এমনকি সন্তান যদি বিপথে যায় এবং পিতামাতা যদি তাদেরকে শাসন করার চেষ্টা করেন, তখন কিছু হলেই সেইসব সন্তানরা বলে ওঠে, পিতামাতা নাকি তাদের ওপর অত্যাচার করছে। পিতামাতা নাকি দুর্ব্যবহার করছে। পিতামাতাকে তারা নাম দেয় এবিউসিভ প্যারেন্টস!

এ সম্পর্কে আরেকটি কাহিনি বলি। একবার এক ব্যক্তি তার বাবার সাথে তর্ক করছিল কোনো এক বিষয় নিয়ে। বাবা-ছেলের মধ্যে মনোমালিন্য হচ্ছিল, কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। এই অবস্থায় বাবা ছেলেকে আঘাত করল। একটা চড় মারল। ছেলের বয়স আঠারো বছর। উপযুক্ত আদব-আখলাক এগুলো তার মধ্যে নেই। এগুলো সে শেখেনি। কাজেই তার রিঅ্যাকশন কী হতে পারে, সেটা তোমরা অনুমান করতে পারছ। সেই ছেলেটা তার বাবাকে পাল্টা আঘাত করল। একবার-দুইবার নয়, আঘাত করতেই থাকল। বাবা রাগ করে তাকে বলল, 'তুই এক্ষুনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যা।' তখন ছেলেটি বলল, 'আমি কেন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব? বরং তোমাকে আমি আজকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো। আমি এখানে থাকব আর তুমি বের হয়ে যাবে।' এই কথা বলে সে বাবাকে টানতে টানতে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায়।

তারা সিঁড়ির একেবারে শেষের দিকে যখন এসে পৌঁছায়, তখন বাবা রেলিংয়ের একটা রড আঁকড়ে ধরে আর ছেলেকে বলে, 'থামো! থামো! এই পর্যন্তই। এর বেশি আর নিয়ো না।' ছেলে অবাক হয়ে যায়। বাবা কী বলছে! তখন বাবা বলে, 'একদিন আমিও আমার বাবাকে মারতে মারতে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম। আর এ জন্যই আজ আমাকে এর পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে।'

এ কারণেই আলিমরা বলেন, পিতামাতার সাথে যেমন আচরণ করবে দুনিয়াতে থাকতেই তার

[১] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নম্বর- ৩২০৯

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিফল পাবে আর আখিরাতের প্রতিফল তো রয়েছেই।

***

গল্প দুটো নিয়ে কিছু কথা[২]

ভাইয়া/আপু, গল্প দুটো কিন্তু কোনো বানানো গল্প নয়। একেবারে সত্যিকারের ঘটনা। আসো, আমরা আমাদের বাবা-মার সঙ্গে সবসময় ভালো আচরণ করব। কোনো বাবা-মা তার সন্তানদের খারাপ চান না। হয়তো তাঁরা তোমাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না। তোমার যুগ, তোমার সময়, তোমার সংগ্রাম তাঁরা ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেন না। হয়তো তাঁরা তোমার ভালো চাইতে গিয়ে, ভালো করতে গিয়ে, মাঝেমাঝে ভুল সিদ্ধান্ত নেন। তোমার ভালো চাইতে গিয়ে ভুল কিছু করে বসেন। কিন্তু আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ এর পরে তাঁরাই তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তুমি যেন একটু ভালো থাকো, একটু সুখে থাকো এ জন্য সারাজীবন শত দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে নেন।

তোমার এই বয়সে হয়তো এসব ভালোমতো বুঝতে পারবে না। নিজের বাবা-মার চেয়ে গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড, বেস্টু, বেস্টি বা গ্যাংদের বেশি আপন মনে হবে। রাতে বাইরে থাকা যাবে না, একা একা ট্যুরে যাওয়া যাবে না, অমুক বন্ধুর সাথে মেশা যাবে না, টিকটক করা যাবে না, গেইম খেলা যাবে না... ইত্যাদি নানা ব্যাপারে বাবা-মার শাসনের কারণে হয়তো তাঁরা তোমার চোখে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাইয়া/আপু, আর কয়েকটা বছর পরেই বোঝা শুরু করবে তোমার সবচেয়ে আপন কারা ছিল—তোমার কথিত এবিউসিভ বাবা-মা নাকি গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড, বেস্টু, বেস্টি আর গ্যাং মেম্বাররা? কিন্তু তখন হয়তো জীবনের অনেক কিছুই হারাবে, জীবনখাতার সাদা কাগজ ভরে যাবে ক্লেদাক্ত কলুষতায়! আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। তোমার আশেপাশে বয়স তিরিশের কাছাকাছি, বিয়েশাদি করেছে, ১/২ টা বাচ্চা আছে, এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, উত্তর পেয়ে যাবে।

[২] লস্ট মডেস্টি

## কুইজে কুইজে সীরাত (পর্ব-২) এর ফলাফল

তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'কুইজে কুইজে সীরাত' দ্বিতীয় পর্বের উত্তর নেওয়া হয়েছে তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত 'আর-রাহিকুল মাখতূম'-এর সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ (২০১১) থেকে। উত্তর হলো :

১. যুদ্ধ-বিগ্রহ। [পৃষ্ঠা-৭১] ২. ফাইয়ায। [পৃষ্ঠা-৭৫]
৩. ইনি হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্বজাহানের রহমতরূপী রাসূল মনোনীত করবেন। [পৃষ্ঠা-৮৬]
৪. আবু উমাইয়া মাখযুমী। [পৃষ্ঠা-৯০] ৫. ৩৫ বছর। [পৃষ্ঠা-৮৯]

**সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে বিজয়ীরা হলেন :**

**▪ মুহাম্মদ শরফুদ্দিন তাওসিফ ▪ রাহাত ▪ নাবিল আহমাদ ▪ আমাতুল্লাহ্ হানীন ▪ নিশাত শিলা**

বিজয়ীদের দ্রুত quiz.sholo@gmail.com মেইলে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# তুমি কি অদৃশ্য হতে চাও?

আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান

ছোটবেলায় একটা সায়েন্স ফিকশন বই পড়েছিলাম। বইয়ের মূল চরিত্র একটা ওষুধ খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে আমারও ইচ্ছা করত, যদি অদৃশ্য হতে পারতাম তার মতো। অদৃশ্য হতে পারলে কত মজার মজার কাজ করা যেত, তাই না? ছোটবেলার সেই শখ পূরণ হয়েছে বড়বেলায় এসে। এখন চাইলেই আমি অদৃশ্য হতে পারি। মিথ্যা বলছি না, সত্যি! তুমিও অদৃশ্য হতে চাও আমার মতো? তাহলে তোমার জন্যেই এই লেখা।

শুরুতে বলে নিই, কেন আমি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হই। ক্লাস নাইন-টেনে পড়তাম তখন। এনালগ ফোনের যুগ শেষ হয়ে বাজারে সবে মাল্টিমিডিয়া ফোন আসা শুরু করেছে। আমার এক বড়লোক বন্ধু মোহসীন বাবার কাছ জেদ ধরে থেকে মাল্টিমিডিয়া ফোন কিনল। স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ফোন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। সে লুকিয়ে ফোন নিয়ে আসত। লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যবহার করত। এভাবে কয়েকদিন চলল। শীত আসি আসি করছে। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। স্কুল শেষে স্কুলেই কোচিং করায়। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

একদিন স্কুল শেষে মোহসীন আর আমাদের আরেকজন বন্ধু হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছিল। মাগরিবের আযান পড়ে গেছে। মেইন রোডের পাশের একটা চিপামতো গলির কাছে আসামাত্র তাকে একটা যুবক ছেলে ডাক দিল। হাতে এক টুকরা কাগজ- বড় ভাই, শোনেন একটু! এই ঠিকানাটা কোথায় বলতে পারেন?

মোহসীন মেইনরোড থেকে চিপা গলিতে যাওয়া মাত্র অন্ধকার থেকে আরও কয়েকটা ছেলে বের হয়ে আসলো। একজন ওর গলায় ক্ষুর ধরে বলল- সঙ্গে যা আছে দিয়ে দাও চাঁদু, না হলে গলা দুফাক করে দেবো। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল মোহসীন। সঙ্গে সঙ্গে মাল্টিমিডিয়া ফোন, টাকা যা ছিল দিয়ে দিল। এই ঘটনার পর মোহসীন খুবই ভেঙে পড়েছিল। সেই এলাকায় আমার আরও দুয়েকজন বড়ভাই, ছোটভাই ছিনতাইকারীর হাতে পড়েছিল।

ভার্সিটিতে পড়ার সময় এরচেয়েও একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন তানযিলের সঙ্গে। সেমিস্টার ব্রেকের ছুটি শেষে সে হলে ফিরছিল। রাতের বাস ছিল। টাঙ্গাইলের কাছে এসে তার বাসে ডাকাত পড়ে। বাসের সবাইকে বেঁধে সমানে মারধর করে ওরা। এরপর সবার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। তানযিল চোখে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তেমন দেখতে পেত না চশমা ছাড়া। ওর চশমাটা পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এরপর সবাইকে চলন্ত বাস থেকে এক এক করে ফেলে দেয়। তানযিলকে ফেলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের এক নির্জন স্থানে। রাত ৪ টার সময়। কী ভয়াবহ অবস্থা, চিন্তা করো।

বাস ডাকাতি, ছিনতাই, নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন এসব ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। পত্রিকার পাতা খুললেই আঁতকে উঠতে হয়। আমাদের সমাজব্যবস্থা ধ্বসে পড়েছে, মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। হানাহানি-মারামারি-শত্রুতা-খুন-রাহাজানি-সন্ত্রাস-জুলুম অনেক বেড়ে গিয়েছে। এজন্যেই আসলে এসব অমানুষদের কাছ থেকে, শত্রুদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাই আমি। তোমারও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দরকার, তাই না?

অদৃশ্য হবার পদ্ধতি সংক্রান্ত নিচের এই লেখাটি নেওয়া হয়েছে Ruqyah Support BD এর ওয়েবসাইট[১] থেকে-

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কুরআনের তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে ﷺ দেখতে পেত না। আয়াত তিনটি হলো :

সূরা কাহফের (৫৭ নাম্বার) আয়াত-

إِنَّا جَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۖ ﴿٥٧﴾

**অর্থ :** নিশ্চয়ই আমি তাদের অন্তরসমূহের ওপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা।

সূরা নাহলের (১০৮ নাম্বার) আয়াত-

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَسَمۡعِهِمۡ وَأَبۡصَٰرِهِمۡۖ ﴿١٠٨﴾

**অর্থ :** এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের ওপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন।

সূরা জাসিয়ার (২৩ নাম্বার) আয়াত-

أَفَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلۡمٖ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمۡعِهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةٗ ﴿٢٣﴾

**অর্থ :** তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আর তার কানে ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন পর্দা।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার এক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোনো প্রয়োজনে রোমে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমের কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। শত্রুরা তার পিছু নেয়। এমন সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তার মনে পড়ে। তিনি দেরি না করে আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে যায়। তিনি যে রাস্তায় চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তাতেই চলাফেরা করছিল, কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 'রাই' অঞ্চলের এক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিররা তাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যান। শত্রুরা

[১] https://tinyurl.com/hiddendua

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল আর তাদের কাপড় তার কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই আয়াত তিনটির সাথে সূরা ইয়াসিনের সেই আয়াতগুলোও মিলানো উচিত, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় তিলাওয়াত করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকেরা তাঁর ﷺ বাসা ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি ﷺ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে তাদের মাঝখান দিয়ে শুধু চলে যাননি, বরং তাঁদের মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করতে করতে যান। কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসিনের আয়াতগুলো (১-৯ নং আয়াত) হলো-

يسٓ ۝١ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ ۝٢
إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ۝٣ عَلَىٰ صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ ۝٤ تَنزِيلَ ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ
۝٥ لِتُنذِرَ قَوۡمٗا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ
فَهُمۡ غَٰفِلُونَ ۝٦ لَقَدۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ
عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۝٧
إِنَّا جَعَلۡنَا فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ أَغۡلَٰلٗا فَهِيَ
إِلَى ٱلۡأَذۡقَانِ فَهُم مُّقۡمَحُونَ ۝٨
وَجَعَلۡنَا مِنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ سَدّٗا وَمِنۡ
خَلۡفِهِمۡ سَدّٗا فَأَغۡشَيۡنَٰهُمۡ فَهُمۡ لَا
يُبۡصِرُونَ ۝٩

**অর্থ :** ১) ইয়া-সিন ২) প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম। ৩) নিশ্চয়ই আপনি প্রেরিত রাসূলগণের একজন। ৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। ৫) কুরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, ৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্বপুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। ৭) তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। ৯) আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সামনে দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দুই জন অশ্বারোহীকে আমার পিছে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। **আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম, নিজেকে আড়াল করার মতো কোনো বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসিনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তি দুই জন আমার সম্মুখ দিয়ে 'লোকটি কোনো শয়তান হবে' বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল।** তারা আমাকে অবশ্যই দেখেনি, আল্লাহ তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।[২]

তাহলে? অদৃশ্য হবার টেকনিক তো শিখিয়েই দিলাম। জলদি মুখস্থ করে নাও। আর যেখানে যখন মন চায় হয়ে যাও অদৃশ্য। তবে হোমওয়ার্ক ফাঁকি দিয়ে ক্লাসে গেলে স্যারের দৃষ্টি থেকে আড়াল হতে পারবে কি না, তার গ্যারান্টি কিন্তু নেই!

[২] মাআরেফুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, পৃষ্ঠা : ৫১২-৫১৪

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ফেলটুস থেকে টপার

(১ম পর্ব)

রাহাত হোসেন

ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট হিসেবেই পরিচিতি ছিল আমার। ক্লাস এইটে উপজেলা সরকারি হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই রেজাল্ট খারাপ হচ্ছিল। অনেকগুলো প্রাইভেটে পড়া, একগাদা গাইড-নোটবুকে টেবিল ছিল ভরা। সকাল ৭ টায় আমার প্রাইভেট পড়া শুরু হতো। ২ টা প্রাইভেট পড়ে স্কুলে যেতাম। এরপর স্কুল শেষে আরও ২ টা। সারাদিন ছুটোছুটি করে বাড়িতে এসে আর পড়তে বসতে ইচ্ছে করত না। সারাদিন পর টায়ার্ড হয়ে যেতাম। একটু রিফ্রেশ হবার জন্য ফোন হাতে নিলে কোনদিক দিয়ে সময় চলে যেত খেয়ালই থাকত না। টিকটক আর ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার পর থেকে ফোনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লাম। পড়তে বসতেই ইচ্ছা করত না। আব্বুর ভয়ে পড়তে বসলেও মন শুধু ছটফট করত। পড়ায় একেবারে মনোযোগ দিতে পারতাম না। লুকিয়ে ফোন ব্যবহার করতাম। আবার ভালোভাবে পড়লেও দ্রুত ভুলে যেতাম। পরীক্ষায় জানা বিষয় ভুল করে আসতাম। যার জন্য হয়তো রেজাল্টের এই অবস্থা হতো।

একদিন আম্মু বলল, আমার পেছনে অযথা টাকা খরচ করে আর লাভ নেই। আব্বু সায় জানিয়ে বলল– আমাকে অটো কিনে দেবে। ভালো স্টুডেন্ট থেকে এভাবে ব্যাকবেঞ্চার হয়ে গেলাম। ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষায় ৩ টা সাবজেক্টে ফেলই করলাম! রেজাল্ট কার্ড নিয়ে বাসায় যাচ্ছি আর ভাবছি আজকে আমার খবর আছে। সেদিন আসলেই আমার খবর হয়ে যেত। তবে খবর হলো না; কারণ আমাদের বাসায় সেদিন বেড়াতে আসলো ফুপাতো ভাই হাসান। আল্লাহর খাস রহমত হিসেবে।

সব শুনেটুনে হাসান ভাই আমাকে পড়াশোনার বেশ কিছু টিপস দিল। সেই টিপস ফলো করে এর পরের পরীক্ষাগুলোতে একের পর এক ছক্কা হাঁকাতে থাকলাম আমি। সেই টিপসগুলোই তোমাদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে শেয়ার করব আমি। যেন আর কারও বাবা কারও পিঠে চেয়ার ভাঙ্গার সুযোগ না পায়!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ফোনের নেশা কাটিয়ে স্মার্ট স্টুডেন্টদের মতো পড়াশোনা করবে কীভাবে?

ফোন সাইলেন্ট অথবা Do Not Disturb মুডে রাখবে

পড়া শেষ হবার আগ পর্যন্ত ফোন অন্য ঘরে বা এমন জায়গায় রাখবে যেখানে ফোনের নাগাল পাওয়া কষ্টকর হবে।

৪৫ মিনিটের একটা এলার্ম দিয়ে রাখো। যতই যা হোক, এর মধ্যে তুমি একবারের জন্যেও ফোন হাতে নেবে না। দিন দিন সময় বৃদ্ধি করবে। প্রথমে ৪৫ মিনিট এরপর ৬০ মিনিট এভাবে।

পড়তে বসার সময় বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দাও, ফোন ব্যবহার নয় পড়াশোনা করাটাই তোমার প্রধান লক্ষ্য।

নো-ফোন জোন তৈরি করো। বাসার নির্দিষ্ট কিছু স্থানে যেমন- পড়ার টেবিল, ডাইনিং টেবিল, বাথরুম, বিছানায় ফোন ব্যবহার করবে না।

সব সময় ফোন নিয়ে ঘোরা বন্ধ করো। বাইরে খেলতে গেলে ফোন বাসায় রেখে যাও। প্রয়োজনে নরমাল এনালগ ফোন ব্যবহার করো।

যে অ্যাপগুলো বেশি সময় নষ্ট করে সেগুলো ডিলিট করে দাও। যেমন- কোনো গেইমিং অ্যাপ, টিকটক বা মেসেঞ্জার অ্যাপ। অ্যাপের পরিবর্তে সরাসরি ব্রাউজার এর মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করো। এতে ফোনের প্রতি টান কিছুটা কমবে।

পড়ার সময় ফোন আম্মু/আপু বা ভাইয়ার কাছে জমা দিয়ে রাখো। বলে দাও, পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন তোমাকে ফোন না দেয়।

যদি ফোন ব্যবহার একেবারেই কমাতে না পারো তাহলে ফোকাস ধরে রাখা, ফোন আসক্তি কাটানোর জন্য সহায়ক অ্যাপ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- Stay Free, Your Hour, Stay Focused, Digitox, Social Fever ইত্যাদি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# স্মার্টভাবে পড়াশোনা করার ১২ টি টিপস :

পর্যাপ্ত আলোর অভাবে প্রোডাক্টিভিটি কমে যায়। রুমের সাধারণ লাইটের পাশাপাশি টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করতে পারো। পাশাপাশি সূর্যের আলো আসে এমন স্থানে পড়তে বসো। ১

২ রাতে পর্যাপ্ত ঘুমাও। কমপক্ষে ৭/৮ ঘণ্টা। বিশেষ করে পরীক্ষার আগের রাতে। মানুষ একটানা বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। ৪৫-৫০ মিনিট পর পর ১০/১৫ মিনিটের একটা ব্রেক নাও। ব্রেকে ফোন ব্যবহার না করে হালকা ব্যায়াম করো বা চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকো। বা বাইরে থেকে ঘুরে আসো।

একেবারে শেষ সময়ে পড়তে না বসে আগে থেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দাও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে পড়ে নাও। এরপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ৩

৪ বিভিন্ন রঙিন পেন্সিল/কলম/ মার্কার দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ো। এভাবে পড়লে দ্রুত আত্মস্থ করতে পারবে এবং বেশিদিন মনে থাকবে।

কোল্ড ড্রিংকস, ভাজাপোড়া, ফাস্ট ফুড মস্তিষ্কের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এসব খাবার এড়িয়ে চলবে। কলা, বাদাম, পালংশাক, মটরশুটি, ভিটামিন সি যুক্ত ফল যেমন কমলালেবু, ডাল, সবুজ শাকসবজি, পর্যাপ্ত পানি রাখবে তোমার খাদ্য তালিকায়। এগুলো তোমার ব্রেইনকে শক্তিশালী করবে। পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে। ৫

৬ পড়তে বসার সময় তোমার মনোযোগ নষ্ট করে দেয় এমন সবকিছু (যেমন ফোন) দূরে সরিয়ে রাখো। সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন বন্ধ করে দাও।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# স্মার্টভাবে পড়াশোনা করার ১২ টি টিপস :

৭ মাঝে মাঝে (বিশেষ করে ঘুমাতে যাবার আগে) চুপচাপ স্থির হয়ে বসে বা শুয়ে যা যা পড়লে তা মনে করার চেষ্টা করো। সেই টপিকগুলোর ওপর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো। এরপর উত্তর দাও। এটি তথ্য মনে রাখার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী।

৮ এমনিতেই তোমার নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। তবে পড়ার চাপ বাড়লে ব্যায়াম করা কখনোই বাদ দেওয়া যাবে না। এটি তোমাকে সতেজ ও চনমনে রাখবে।

৯ পড়তে বসার পূর্বে কিছুক্ষণ কুরআন শুনে বা পড়ে নিতে পারো। এর ফলে বিভিন্ন চিন্তা তোমার মাথা থেকে দূর হয়ে মন স্থির হবে। পড়ায় দ্রুত মনোযোগ দিতে পারবে।

১০ পড়া শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করবে।

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

( রাব্বি যিদনি ইলমা )

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

(সুরা ত্ব-হা, আয়াত : ১১৪)

১১ বেশি রাত জেগে পড়বে না। দ্রুত ঘুমিয়ে যাবে। ফজরের পর পড়াশোনার সবচেয়ে ভালো সময়। কয়েকদিন চেষ্টা করলেই ফজরের পর পড়ার অভ্যাস আয়ত্তে আনতে পারবে। প্রয়োজনে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

১২ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখবে।
এভাবে যেকোনো বিষয় তুমি খুব দ্রুত আত্মস্থ করতে পারবে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# স্মার্ট স্টুডেন্টদের মতো যেভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে :

**পরীক্ষার দুই সপ্তাহ বাকি** কীভাবে রিভিশন দেবে তা ঠিক করে নাও। অল্প অল্প করে পড়া শুরু করো। এখন ফাঁকিবাজি করলে শেষমুহূর্তে পাহাড়সমান পড়া জমে যাবে। পড়ার চাপে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।

**পরীক্ষার এক সপ্তাহ বাকি** বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সলভ করো, মডেল টেস্ট দাও, তোমার বন্ধুদের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করো, অন্যদের সাথে পরীক্ষার প্রস্তুতি, সাজেশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করো।

**পরীক্ষার আগের রাতে** কলম, স্কেল, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি, এডমিট কার্ড সব গুছিয়ে নাও। কীভাবে পরীক্ষার হলে যাবে তা ঠিক করে রাখো। রাত না জেগে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ো। ৭/৮ ঘণ্টার একটা ঘুম দাও।

**পরীক্ষার দিন সকালে** খুব ভালোমতো নাস্তা করো। নাস্তা না করলে পরীক্ষার হলে তোমার মাথা ঠিকমতো কাজ করবে না। পরীক্ষার হলে যাবার আগে দু রাকাত নামাজ পড়ে পরীক্ষায় সফলতার জন্য দুআ করো।

**পরীক্ষার ১ ঘণ্টা আগে** পরীক্ষার হলে চলে যাও। টেনশন না করে বন্ধুদের সাথে গল্প করো। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।

**পরীক্ষার ১ মিনিট আগে** আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। বিসমিল্লাহ বলে লেখা শুরু করো।

**পরীক্ষা শেষের ১ ঘণ্টা পরে** উত্তর মেলানোর দরকার নেই। ভালো / খারাপ যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। বাসায় ফিরে বিশ্রাম নাও। পরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নাও।

*আজ এ পর্যন্তই। সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ আরও অনেক টিপস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে।*

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ক্ষমা

নাঈমুল হাসান তানযীম

ইমাম সাহেব এ নিয়ে তিন-চারবার নিষেধ করলেন বক্স বাজানো বন্ধ করতে। তবুও ওদের হুঁশ ফেরেনি। উল্টো ইমাম সাহেবকে ঝাড়ি দিয়ে মসজিদে যেতে বলল।

—'খায়া দায়া কোনো কামকাইজ নাই। পাইসে একটা, আমরা কোনো মজা ফূর্তি করলেই শালার বকবকানি শুরু হয়া যায়। আবার আসুক, দাঁড়া, একদম সোজা কইরা দিমু।'

দাঁত কটমট করে কথাগুলো বলল সৌরভ। চোখেমুখে যেন প্রতিশোধের অগ্নি-লাভা দাউদাউ করছে। সমবয়সীদের মধ্যে ও একটু স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী। চাপাবাজী আর পল্টিবাজীতে সবার 'সেরা'।

ঈদকে কেন্দ্র করে এবার পিকনিকের আয়োজন করেছে ওরা। প্রধান ভূমিকায় আছে সৌরভ, রনি, কিবরিয়া আর সুমন। সারাদিন মহল্লার মাঠে ধুমধামে বক্স বাজাবে আর নাচবে। শেষে বিরিয়ানি খাওয়ার মধ্য দিয়ে পিকনিক শেষ করবে—এমনটিই ওদের প্ল্যান প্রোগ্রাম।

কিন্তু ঝামেলা বাধালেন ইমাম সাহেব। উনি একটু পরপর এসে বক্স বন্ধ করতে বলে যান। বলেন, মুসল্লিদের নামাজে নাকি ব্যঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, অসুস্থ রোগী, বয়স্ক ও শিশুদের কষ্ট হচ্ছে। সৌরভরা ইমাম সাহেবের এই নিষেধাজ্ঞা কানেই নেয়নি। উল্টো আগের তুলনায় আরও জোরে জোরে বক্স বাজাতে শুরু করল। তৃতীয়বার যখন ইমাম সাহেব নিষেধ করতে এলেন তখন তো ওরা রীতিমতো হুমকিধামকি দিয়ে দিল।

'আবার আসলে কিন্তু সমস্যা হয়া যাইব কইলাম!' সৌরভের কড়া হুশিয়ারী। কিন্তু ইমাম সাহেব দমে যাওয়ার পাত্র নন। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে তিনি প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

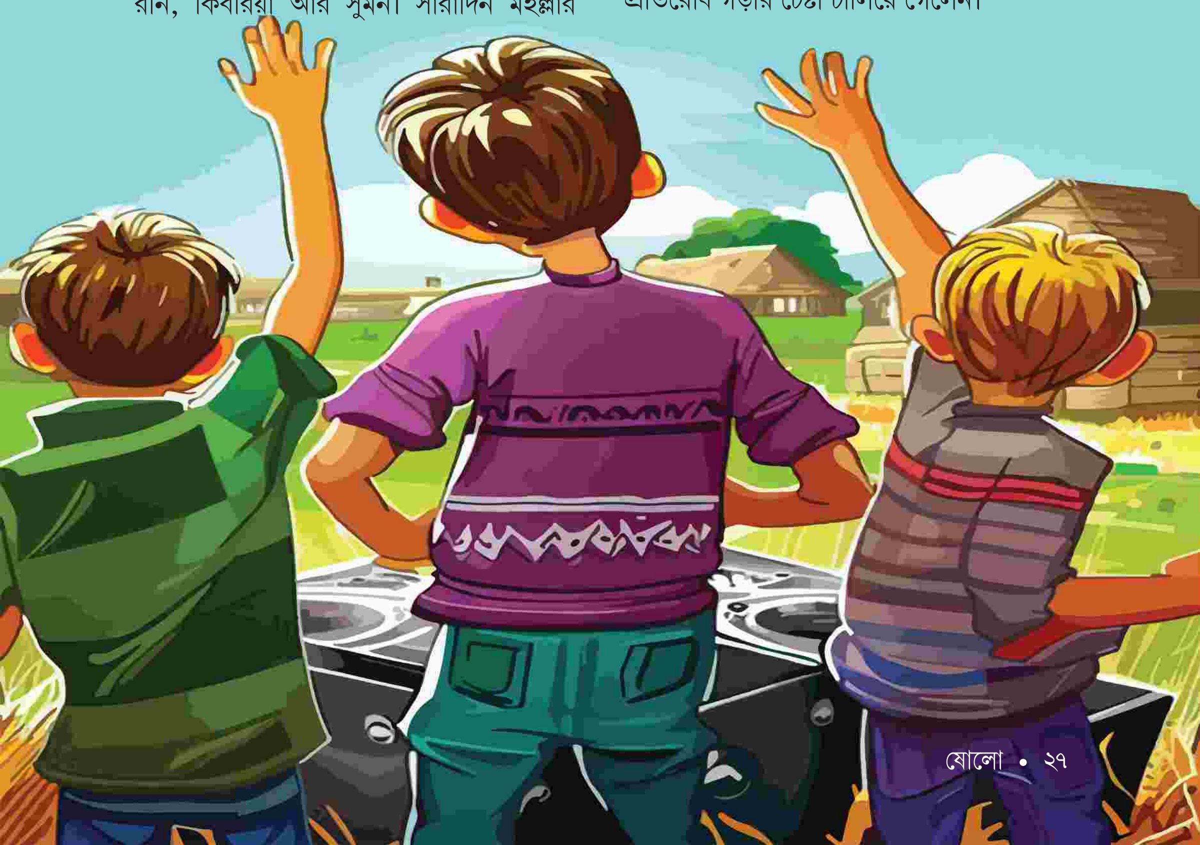

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থবার কয়েকজন মুসল্লিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসলেন ইমাম সাহেব। এবার যেন একটু উত্তেজিতই হয়ে উঠলেন।

—'কী ব্যপার! তোমাদেরকে এত করে বলছি তারপরেও তোমরা থামছ না! কী শুরু করে দিলে তোমরা? বলো তো!'

জবাবে প্রথমে মুখ খুলল কিবরিয়া।

—'হুজুরের মনে হয় ভাল্লাগতাসে না, তাই না! ভালো কইরা বলতাসি, ডিস্টার্ব কইরেন না, অবস্থা কিন্তু বেশি ভালো হইব না, কয়া দিলাম।'

চৌদ্দ বছর বয়সী এই পুঁচকে ছেলের মুখে এ ধরনের হুমকি শোনে কার মেজাজ ভালো থাকবে! ঠাস করে মুসলিম উদ্দিন মিয়া চড় বসিয়ে দিলেন ওর গালে। 'বেয়াদব কোথাকার! কার সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় আদবকায়দা কিছুই জানোস না!'

মুসলিম উদ্দিন মিয়ার এই একটি চড় যেন ওদের ক্ষোভে আগুন ধরিয়ে দিল। এতক্ষণ সবকিছু চেয়ে চেয়ে দেখছিল সৌরভ। এবার বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল। পাশে রাখা একটা বাঁশের কঞ্চি হাতে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে শপাং শপাং করে পেটাতে শুরু করল মুসলিম উদ্দিন মিয়া, ইমাম সাহেব এবং আগত মুসল্লিদের। ওর দেখাদেখি যে যা হাতে পেল তা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। সুমন নামের ছেলেটা ওদেরকে বাধা দিতে গিয়েছিল, উল্টো ওর পিঠেও পড়ল কঞ্চির আঘাত।

ছেলেপেলেগুলোর হঠাৎ এমন আচরণে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন ইমাম সাহেব। কোনোমতে নিজের জান বাঁচিয়ে মুসল্লিদের নিয়ে ফিরলেন মসজিদে। ইমাম সাহেবের ডান হাতের কোণে রক্ত জমে গেছে। মুসলিম উদ্দিন মিয়া কপালে শক্ত আঘাত পেয়েছেন। খুব সম্ভবত কেউ ভাঙা ইট ছুঁড়েছিল। তা ছাড়া বাকি দুইজন তেমন চোট পাননি। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতভম্ব। এলাকাবাসীর কানে পৌঁছতেও বেশি সময় লাগেনি।

তখন মসজিদে মাগরিবের আজান হচ্ছিল। পুরো মসজিদ ভর্তি ছিল মুসল্লিদের দিয়ে। ইমাম সাহেবের সঙ্গে ঘটা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা তাই খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে মুসল্লিদের ভেতর। চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল তৎক্ষনাৎ ছুটে গেল পিকনিকের স্থানে। কিন্তু গিয়ে কোথাও পাওয়া গেল না ওদের। ওরা বুঝতে পেরেছে, আজ আর ওদের রক্ষা নেই। তাই আগেভাগেই পালিয়েছে।

পরেরদিন এলাকাবাসী মিটিংয়ে বসল, ঘটে যাওয়া এ ঘটনার সুরাহা করতে। সৌরভ-কিবরিয়া গ্যাংদের ধরে আনা হলো। মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমে ওদের প্রত্যেকের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হবে, তারপর একশো বার করে কান ধরে ওঠবস করবে। শেষে ইমাম সাহেব এবং মুসলিম উদ্দিন মিয়াসহ পুরো এলাকাবাসীর কাছে উক্ত ঘটনা ঘটাবার জন্য ক্ষমা চাইবে। কিন্তু এইখানেও ঝামেলা বাধালেন ইমাম সাহেব। বললেন এক আজব কথা।

'আমার পক্ষ থেকে আজকের মতো ওদের ক্ষমা করে দেওয়া হলো। ওরা তো ছোট মানুষ। অবুঝ। আশা করি, ওরা ওদের ভুলটা বুঝতে পেরেছে। তাই আমি বলব, সামনে থেকে যাতে আর কখনো এমন দূর্ঘটনা না ঘটায়।'

ইমাম সাহেবের এমন ফায়সালা মেনে নিতে এলাকাবাসী প্রথমে অসম্মতি জানালেও পরে ইমাম সাহেবের পীড়াপীড়ির কারণে মেনে নিলো। সৌরভ কিবরিয়ারাও নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। কেউ বলার আগেই ওরা দৌড়ে এসে ইমাম সাহেবের পায়ে পড়ল। করজোড়ে ক্ষমা চাইল। অটোমেটিক ওদের চোখ বেয়ে যেন অশ্রুর বান বইতে লাগল। এলাকাবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আশ্চর্য হয়ে দেখল ইমাম সাহেবের ক্ষমার মহত্ত্ব এবং ফল।

তারপর থেকে মোহাম্মদবাগ এলাকায় কখনো পিকনিকের নামে এমন গানবাজনা হয়নি। ইমাম সাহেবের উদার ক্ষমার কারণে সৌরভ কিবরিয়ারাও হয়ে গেল তাঁর ভক্ত। ওরা এখন মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

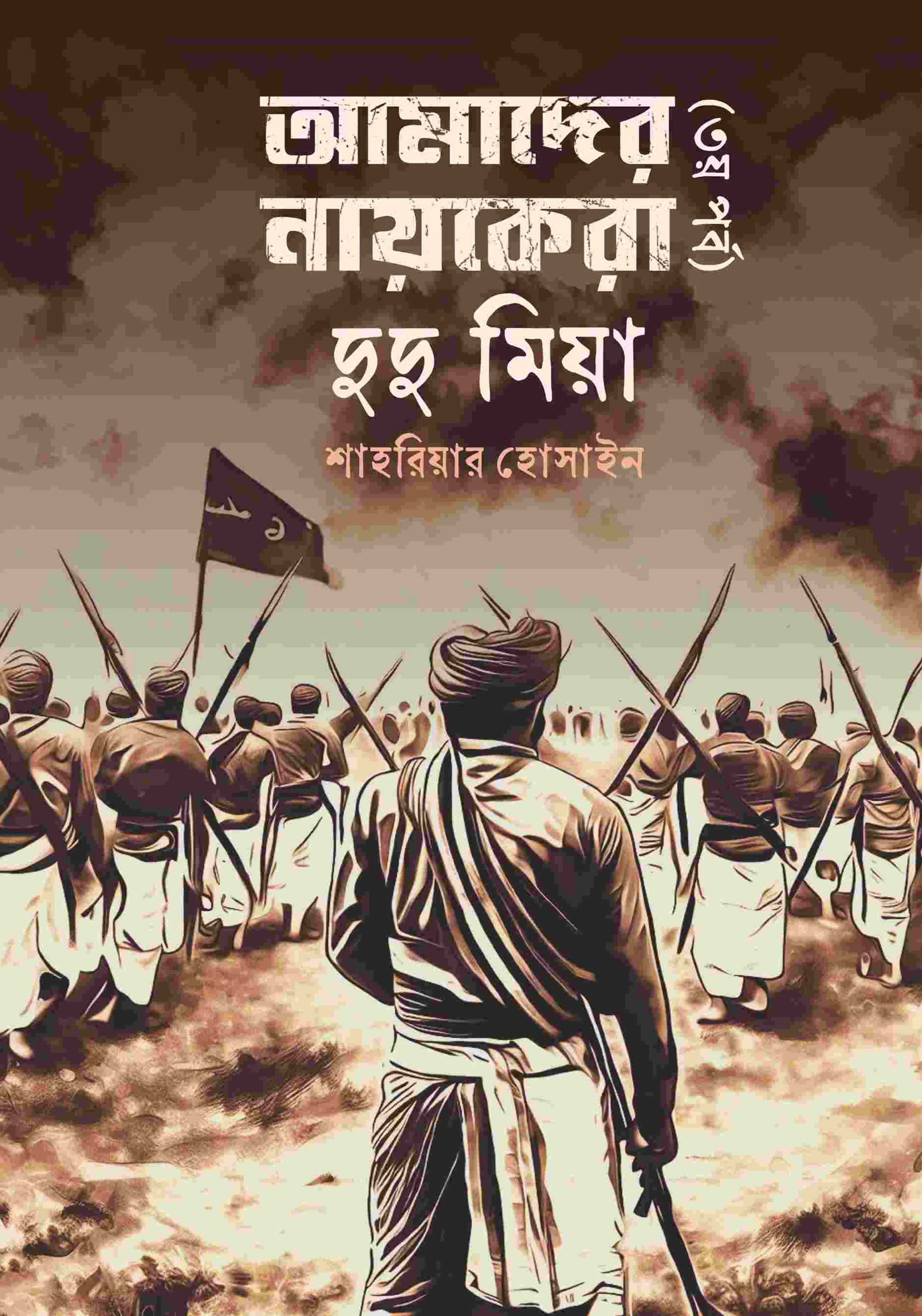

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্রিটিশরা আসার পূর্বে বাংলা শাসন করত মুসলিমরা। সে সময় বাংলা ভূখণ্ড ব্যাপক সমৃদ্ধশালী ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে উর্বর ভূমি ছিল আমাদের। ফসলের পাশাপাশি সিল্ক, তুলা, তাঁত ও বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। ঢাকাকে ম্যানচেস্টারের মতো শিল্পসমৃদ্ধ শহরের সাথে তুলনা করা হতো। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর অবস্থা প্রায় রাতারাতি বদলে যায়। ইংরেজরা ব্যাপক আকারে আমাদের শোষণ করা শুরু করে। কয়েক বছরের মাথাতেই ১৭৭০ সালে সংঘটিত হয় ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে যা ছিয়াত্তরের মনন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। কেউ বলেন, এই সংখ্যা কোটির কাছাকাছি। এর ফলে বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মুছে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর হবার পর বাংলাতে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। এদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং কলকাতাকেন্দ্রিক। তারা আমাদের পূর্ববঙ্গের মুসলিমদেরকে ব্যাপকভাবে শোষণ করা শুরু করে। দাড়ি রাখা, আযান দেওয়া, গরু জবাই করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দরিদ্র, নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহায় পায় না।

ইংরেজরা আমাদের তাঁত ও বস্ত্র শিল্প ধ্বংস করে দেয়। আমাদের বিখ্যাত শাড়ি মসলিন হারিয়ে যায়। তাঁতিদের আংগুল পর্যন্ত কেটে নিত ওরা, যেন তাঁত বুনতে না পারে। আমাদের কৃষকদের জন্য ধান চাষ করা ছিল লাভজনক। কিন্তু সে সময় ইউরোপে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। এর জন্য দরকার পড়ে নীলের। ইংরেজরা আমাদের চাষীদের বাধ্য করে নীল চাষ করতে। নীলকরেরা চাষীদের সাথে খুবই নিষ্ঠুর আচরণ করত। হিন্দু-মুসলিম দেখত না। নীলচাষীদের অত্যাচার অনুসন্ধানের জন্য ১৮৬০ সালে গঠিত হয় নীলকর কমিশন। তারা প্রতিবেদনে বলে, ইংল্যান্ডে যে নীলের বাক্সগুলো যায় সেই বাক্সগুলোর প্রত্যেকটি মানুষের রক্তে রঞ্জিত।

আসলে সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষ করে পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে ছিল কেবল হাহাকার আর কান্না। মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠত। ইংরেজরা বেনিয়া জাত। আমরা ছিলাম সবচেয়ে ধনী অঞ্চল। কাজেই আমাদের ওপর ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদারদের নজর বেশি ছিল। শোষণ আর জুলুমের এক লজ্জাজনক ইতিহাস রচনা করে তারা। পূর্ব বাংলায় নেমে আসে এক গভীর অন্ধকার। ক্ষুধা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, রোগব্যধি, জুলুম, বঞ্চনা নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় আমাদের পূর্বপুরুষদের।

এমনই এক ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে পূর্ববাংলা তথা ভারতবর্ষের সকল ধর্মের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের জন্য আলো জ্বেলে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ফরায়েজীরা। তাঁরাই ভারতবর্ষে প্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেছিলেন ইংরেজ আর তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে। এ তথ্য শুনে গর্ব হচ্ছে না তোমার?

আমি যখন প্রথম জেনেছিলাম আমার খুব গর্ব হয়েছিল। আমাদেরকে ভেতো বাঙ্গালী হিসেবে অনেকেই অবজ্ঞা করে। অথচ আমরাই প্রথম ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম! ফরায়েজী আন্দোলনের রূপকার হাজী শরীয়তউল্লাহকে নিয়ে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম।[১] আজ আমরা আলোচনা করব ফরায়েজী আন্দোলনের আরেক বিখ্যাত নেতা, হাজী শরীয়তউল্লাহ রহিমাহুল্লাহর যোগ্যপুত্র মুহসিন উদ্দীন দুদু মিয়াকে নিয়ে।

১৮১৯ সাল। মাদারিপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্ম হয় তাঁর। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁকে মক্কায় পাঠানো হয় জ্ঞানার্জনের

[১] বিস্তারিত পড়ে নাও ষোলো চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হাজী শরীয়তউল্লাহর জীবনী - https://tinyurl.com/shariatullah

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য। ছোট থেকেই তাঁর অন্তরে তাওহীদ, শিরক এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো গেঁথে যায়। পিতার শিক্ষা এবং সংগ্রামী জীবন দেখতে দেখতে তিনিই পিতার মৃত্যুর পর ফরায়জী আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে উঠেন।

ঐতিহাসিক সূত্রমতে, কলকাতা হয়ে মক্কা গমনকালে বারাসাতে তাঁর সাথে বাংলার আরেক মহান বীর তিতুমীরের[২] দেখা হয়। তিনি মক্কায় পাঁচ বছর গভীর অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৭ সালে দুদু মিয়া মক্কা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন।

১৮৪০ সালে পিতা হাজী শরীয়তউল্লাহর ইন্তেকালের পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দুদু মিয়া। তাঁর অধীনে বাংলা ও আসামের নিপীড়িত জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় ব্রিটিশদের বশংবদ অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

**দুদু মিয়া অসাধারণ সাংগঠনিক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ফরায়েজীদের সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলাফল ছিল বিস্ময় জাগানিয়া।**

ইংরেজ ঐতিহাসিক ডা. জেমস ওয়াইজ বিস্মিত হয়ে ফরায়েজী আন্দোলন নিয়ে রচিত তার বইতে লিখেন–

‘মাত্র কয়েকজন লোক এই আন্দোলন শুরু করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা এক বিশাল ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এই বৃক্ষ এখন পুরো পূর্ববঙ্গে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। এই আন্দোলনে জমিদার ও ধনী শ্রেণির সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল না। সরকারেরও কোনো পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন ছিল না। তা সত্ত্বেও কীভাবে এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির প্রায় সকলেই এটাকে গ্রহণ করে নেয়?’

সেই সময়কার বেঙ্গল পুলিশের এক কমিশনারের মতে ফরায়েজীদের মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৮০ হাজার। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বেঙ্গল হরকরা পত্রিকার সম্পাদক অ্যালেক্স্যান্ডার ফোর্বসের মতে সংখ্যাটা ছিল ৩ লাখ।

চলো, দুদু মিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও কৌশল সম্পর্কে জেনে নিই।

**লাঠিয়াল বাহিনী গঠন :** দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। কেউ কোথাও অত্যাচারিত হচ্ছে শুনলে তিনি লাঠিয়াল বাহিনী পাঠিয়ে দিতেন। কোনো অত্যাচারিত হিন্দু দুদু মিয়ার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি কখনো তাদের ফিরিয়ে দিতেন না। বরং তাদের বিশেষভাবে সাহায্য করতেন।

লাঠিয়াল বাহিনীর ভয়ে ইংরেজ সৈনিক ও জমিদার এবং নীলকরেরা থরথর করে কাঁপত। দুই দশক অর্থাৎ ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ফরায়েজী আন্দোলন অধ্যুষিত এলাকায় শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে। সাধারণ জনগণ সকল ধরনের জুলুম ও শোষণের হাত থেকে রেহায় পায়। মুসলিমরা নিশ্চিন্তে আযান দেওয়া, দাড়ি রাখা, গরু জবাই করতে পারতেন।

**স্থানীয় আদালত প্রতিষ্ঠা :** ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদার নীলকরেরা আদালতের মাধ্যমে জুলুম করত। দুদু মিয়া এজন্য নিজস্ব বিচারব্যবস্থা তৈরি করেন। স্থানীয় মুরব্বিদের দিয়ে আদালত (তথা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করেন ও ইংরেজদের আদালত বয়কট করতে বলেন। সব ধরনের বিবাদের মীমাংসা করা হতো এই আদালতগুলোতে। ন্যায়বিচার পাওয়ায় অল্পদিনেই ফরায়েজীদের আদালত ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। জানা যায়, আমাদের ঢাকাতেই

---

[২] বিস্তারিত পড়ে নাও ষোলো তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তিতুমীরের জীবনী –
১ম পর্ব : https://tinyurl.com/titumir1
২য় পর্ব : https://tinyurl.com/titumir2

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২২ টির বেশি ফরায়েজী আদালত ছিল।

**হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মের নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করা :** অনেক উগ্র ব্যক্তি দাবি করে, দুদু মিয়া উগ্র ছিলেন, সাম্প্রদায়িক ছিলেন। অথচ তিনি হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন।

বাংলার পুলিশ সুপার ড্যাম্প্যাইয়ার ড. ওয়াইজ মন্তব্য করেন, 'ফরায়েজীরা জাতভেদ দূর করে ইসলামের আলোকে মানুষে মানুষে সমতা ও ভাতৃত্ববোধ তৈরি করেন। নীচু জাতের মানুষদের বিষয়াবলি উঁচু জাতের মানুষের বিষয়াবলির মতোই সমান গুরুত্ব দেওয়া হতো। ফরায়েজীরা পরস্পর একতাবদ্ধ থাকা ও বিপদাপদে সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন।

জেমস ওয়াইস, উইলিয়াম হান্টারসহ অন্যান্য ইতিহাসবেত্তাগণ বলেছেন, **'সব ধর্মের জালিমরাই ফরায়েজীদের শত্রুতে পরিণত হয়। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে যে উদ্দীপনা নিয়ে তারা লড়াই করেছেন সেই একই উদ্দীপনা নিয়ে তারা অত্যাচারী মুসলিম জমিদার ও ইংরেজ নীলচাষীদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতেন।'**

**খলীফা নিয়োগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকা :** দুদু মিয়া নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানি অনৈক্য পছন্দ করতেন না। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেন। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য তিনি প্রত্যেক এলাকায় খলীফা নিয়োগ দেন। খলীফারা ছিল তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ। তাঁদের কাজ ছিল স্থানীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, মুষ্ঠি সংগ্রহ করা, স্থানীয় কোর্ট পরিচালনা করা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা। ইংরেজ প্রশাসনের সমান্তরালে দুদু মিয়া নিজেই যেন একটা প্রশাসন বা ছায়া সরকার পরিচালনা করতেন।

নবীনচন্দ্র সেন, সেই সসময়কার এক সাব-ডিভিশন অফিসার বলেছিলেন– 'ফরায়েজীরা ব্রিটিশ রাজের পাশাপাশি নিজেদের এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।'

খলীফা নিয়োগের ফলে বিভক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, তথ্য আদান-প্রদান, মুষ্ঠি তথা চাঁদা সংগ্রহ ও কূটনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগ সহজ হয়। বিশাল অঞ্চলজুড়ে সমন্বিত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

**ইংরেজ ও তাদের এজেন্টদের ওপর অর্থনৈতিক বয়কট :** হাজী শরীয়তউল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন জমিদার এবং ইংরেজদের কোনো ধরনের কর না দিতে। আমাদের দুদু মিয়া পিতার পথ ধরেই ঘোষণা করলেন- জমি যে চাষ করবে ফসলের মালিক হবে সে-ই। ইসলামে বলা হয়েছে, ফসলের জন্য শুধু উশর দিতে হবে। এ ব্যতীত কোনো কর যেন কাউকে দেওয়া না হয়। ইংরেজরা কূটকৌশলের মাধ্যমে মাসজিদ, মাদরাসা ও খানকার অনেক ওয়াকফকৃত জমি দখল করে নিয়েছিল। দুদু মিয়া খাস জমি ও বন এলাকা দখল করতে শুরু করেন। খাস এলাকায় দরিদ্রদের থাকার ব্যবস্থা করেন।

১৮৫৭ সালে যখন গোটা ভারতে মহাবিদ্রোহের ডামাডোল চলছিল, ঠিক তখনই জমিদার ও নীলকররা দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সরকারের কান ভারী করে তোলে।

১৮৪৬ সালে এনড্রিও এন্ডারসনের গোমস্তা কালি প্রসাদ মনিবের আদেশে সাত আটশ লোক নিয়ে দুদু মিয়ার বাড়িতে চড়াও হয় এবং প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের অলংকারাদিসহ বহু ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় বিচার চেয়ে তিনি মামলা করেন। কিন্তু কোনো বিচার না পাওয়ায় অবশেষে নিজেই শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে ডানলপের কারখানা আক্রমণ করেন। আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন সেই কারখানা। তাঁর এই

সাফল্যে জমিদার ও নীলকররা শংকিত হয়ে পড়ে। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে একের পর এক মামলায় দুদু মিয়া ও তাঁর অনুসারীদের ফাঁসাতে শুরু করে। অবশেষে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের আবহাওয়া তৈরি হলে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে পারে এই অজুহাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় তিনি যদি জেলের বাইরে থাকতেন তাহলে এই বাংলা তথা উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হতো। তাঁর অনুপস্থিতির কারণে ফরায়েজীদের বিপুল শক্তি ভালোমতো কাজে লাগানো যায়নি সে সময়।

দুদু মিয়া ১৮৫৯ সালে মুক্তি পেলেও অসৎ জমিদারদের উসকানিতে আবারও বন্দি হন। কোনো মামলা না থাকা সত্ত্বেও ১৮৬০ সাল পর্যন্ত তাঁকে কলকাতার অদূরে আলীপুরে বন্দি রাখা হয়। যখন তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়। মুক্তির অল্পকাল পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এর পর তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। এখানেই ইন্তেকাল করেন তিনি। পুরান ঢাকার ১৩৭ নং বংশাল রোডে কবর দেওয়া হয় তাঁকে। এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন কুফর এবং শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা এই সিংহপুরুষ।

**দুদু মিয়া বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মতো গতানুগতিক রাজনীতি করেননি। ইসলামী মূল্যবোধ ও জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের পাশে দাঁড়ানোর স্পৃহা থেকে তাঁর পিতা যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তিনি তাতে রাজনৈতিক রং দেন। তবে এই রং মানুষের বানানো কোনো তন্ত্রমন্ত্রের ছিল না। বরং এই রঙের উৎস ছিল ইসলামী শরীয়াহ।**

তিনি সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। কিন্তু কৌশলে ঠিকই ইংরেজদের উচ্ছেদের জন্য কাজ করেছেন। ইংরেজ ও জমিদারদের কর প্রদান বন্ধ, খাসমহল দখল, অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ, লাঠিয়াল বাহিনী গঠণ, স্থানীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ছায়া সরকার পরিচালনা, জনগণকে হানাহানি, মারামারি পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনে উৎসাহিত করা, কূটনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা ইত্যাদি ছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সমতুল্য। ইংরেজরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল তা।

বাংলার পুলিশ সুপার ড্যাম্প্যাইয়ার, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসহ অন্যান্যরা বলেছিল, ‘পূর্ব বাংলায় হাজী শরীয়তউল্লাহর হাতে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদেরকে বের করে পুনরায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা ও বহাল রাখা।’

সাধারণ মানুষ প্রাণভরে তাঁকে ভালোবাসত। তিনি ছিলেন বাংলার অঘোষিত বাদশাহ। ১৮৪৭ সালে কলকাতা রিভিউ দুদু মিয়াকে বাদশাহর সাথে তুলনা করে। নীল কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়- ‘দুদু মিয়াকে দমন করার প্রচেষ্টা ব্যাপক রক্তপাতের সূচনা করবে।’

একবার ফরিদপুর কোর্টে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো। তিনি নাকি কোনো এক নীলকর হত্যাচেষ্টার সাথে যুক্ত। রায়ের দিন কোর্টের পাশের নদীতে প্রায় ৩০০০ নৌকা এসে হাজির। ৩০০০ নৌকাভর্তি ফরায়েজী অপেক্ষা করছে। আদালত দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে রায় দিলে কোর্ট ভেঙ্গে তাঁকে মুক্ত করা হবে।

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গ্রন্থের লেখক সুপ্রকাশ রায় বলেন, ‘দুদু মিয়ার নেতৃত্বে অন্তত পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক যেকোনো সময় জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে লইয়া সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িতে ইতস্তত করিত না।’

বাংলার এই অঘোষিত বাদশাহকে নিয়ে আজকাল তেমন আলোচনা হয় না। সব জায়গা থেকে তাঁকে মুছে ফেলা হয়েছে, হচ্ছে। তবে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চাইলেই কি তাঁর মতো মহামানবকে মুছে ফেলা যায়? তিনি থাকবেন বাংলার প্রতিটি কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীর হৃদয়ে। যারা এ জমিনকে, এ জমিনের মানুষগুলোকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসে। যারা অশ্লীলতা, অনাচার, অনৈতিকতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, বিভেদ, হানাহানিতে ভরে যাওয়া এই সমাজকে বদলে দিয়ে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে চায়। যারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকল নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। তিনি থাকবেন প্রত্যেক ন্যায়ের পথের পথিকের আলোর দিশারী হয়ে।

**সালাম জানাই আপনাকে, হে মহান বীর! ভোরের শিশিরের মতো রহমত ঝরে পড়ুক আপনার কবরে।**

তথ্যসূত্র –


১. The Political Ecology of the Peasant: the Faraizi Movement between Revolution and Passive Resistance
২. বাংলায় ফরায়েযী আন্দোলনের ইতিহাস, মুঈন উদ-দীন আহমাদ খান
৩. Ideology of the faraizi movement of Bengal, Muhammad Ahsan Ullah, Prof. Ishtiyaq Ahmad Zilli
৪. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, উইলিয়াম হান্টার
৫. বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান
৬. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়
৭. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ


*****


# ষোলোতে লেখা পাঠাও তুমিও!

ষোলো ম্যাগাজিনে নিজের লেখা দেখতে চাও? দেরি না করে জলদি পাঠিয়ে দাও আমাদের এই মেইলে editor.sholo@gmail.com। মেইলের সাবজেক্টে লিখবে ‘ষোলোর জন্য লেখা’। যত দ্রুত লেখা পাঠাবে পরবর্তী সংখ্যায় লেখা প্রকাশ হবার সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে।

**যে যে বিষয়ে লেখা দিতে পারবে :**

শুধু ইসলামী লেখা হতে হবে এমন নয়। লিখতে পারো তোমার স্কুল-কলেজের মজার কোনো ঘটনা, থ্রিলার, ভূতের গল্প, রহস্যগল্প, রম্যগল্প, ভ্রমণকাহিনি, ছোটগল্প, সায়েন্স ফিকশন, ছড়া-কবিতা, কমিকস। সেলফ হেল্প, মোটিভেশন, ক্যারিয়ার টিপস, লাইফ হ্যাকস, লাইফ স্কিল, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, অর্থনীতি, ট্রিভিয়া... মনে যা চায় লিখতে পারো সেগুলো। যাদের লেখা প্রকাশিত হবে তাদের জন্য ষোলো’র পক্ষ থেকে থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# উত্তরের অপেক্ষায়...

লস্ট মডেস্টি

কথা হচ্ছিল বন্ধু সোহানের সাথে। প্রেম নিয়ে বই লিখছি জেনে একটু কৌতূহলী হলো।[১]

গুল মারিস না। তুই হুজুর হইয়া বই লিখবি প্রেম নিয়া? হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল সে।

বিস্তারিত শোনার পর বলল– বাহ চমৎকার! শোন তবে, তোকে আমার একটা ঘটনা বলি।

প্রায় পনেরো বছর আগের ঘটনা। আগুন ঝরা চৈত্রের দিন। সেদিন আমার মরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।[২] এত্ত আনন্দ এত্ত আনন্দ!

বয়সটাই মনে রঙ লাগার। চোখে রঙিন চশমা। সেই রঙিন চশমা দিয়ে সবকিছুই ভালো লাগে। রবি ঠাকুরের ভাষায়—
'ফুলের বনে যারেই দেখি তারেই লাগে ভালো!'

কালো চোখের এক বালিকাকে একটু বেশি ভালো লেগে গেল। আড়ালে আবডালে থেকে চুরি করে বালিকাকে দেখি। বাম বুকে সুখের মতো ব্যাথা লাগে। বালিকাও মাঝে মাঝে চেরা চাহনি হানে আমার দিকে। মনে হয় বুকের মধ্যে কে যেন ছুরি মেরে দিল। উফফফ! কী অসহ্য সুন্দর সেই দিনগুলা।

সেইদিন বালিকা আমার দিকে সোজাসুজি অনেকক্ষণ চেয়ে ছিল। সেই বিশেষ কথাটি বলব বলব করেও বলা আর হয়ে উঠল না। কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ এই খুশিতেই আমি ধরাশয়ী!

অংকে ঘাপলা হতে লাগল, ক্লাসে মন থাকত না। শুধু সেই বালিকার অতলান্ত কালো দু'চোখ আমার ঘোলা চোখের সামনে ভাসত। আকাশে, বাতাসে, জলে ডাঙ্গায়, অন্তরীক্ষে শুধু সেই বালিকার কালো দু'চোখ।

মসজিদে নিয়মিত হয়ে গেলাম। নামাজ পড়া আর কীসের কী, শুধু দুআ করা! ইয়া আল্লাহ, বালিকার সঙ্গে আমার 'ইয়ে'টা ঘটিয়ে দাও আল্লাহ। আমি একেবারে ভালো হয়ে যাব আল্লাহ। একেবারে। আর নামাজ মিস দিব না, মায়ের কথা শুনব। আল্লাহ, 'ইয়ে' টা ঘটিয়ে

[১] *'আকাশের ওপারে আকাশ'* বই লেখার জন্য অনেকের সাথেই প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে কথা বলতে হয়েছে।
[২] সত্য ঘটনা।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দাও আল্লাহ!

কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে উত্তর পেলাম না। আরও অনেক কারণে জল আর বেশিদূর গড়াল না। আমিও ভুলে যেতে থাকলাম সেই বালিকাকে। একেবারে নয় যদিও। বয়ঃসন্ধিকালের সেই মোহের কথা মনে হলে মাঝেমাঝেই একটু ইমোশনাল হয়ে যেতাম।

হেমন্তের আগুনঝরা রুপালী নক্ষত্রের রাত যখন আসত, যখন পরিযায়ী পাখিরা ডানা মেলত আকাশে চাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অথবা যখন গ্রীষ্মের ক্লান্ত দুপুরের এক মহাদেশ নীরবতা ভঙ্গ করে বাবলা বনে অবিরাম আর্তনাদ করত নিঃসঙ্গ একটা ঘুঘু পাখি, বালিকার রাঙ্গা রাজকন্যার মতো মুখটা মনে পড়ে যেত। বুকের অনেক ভেতরে বহু কষ্টে চাপা দেওয়া সেই কালো চোখ দুটো চেরা চোখে তাকিয়ে থাকত যেন আমার দিকে। দুস্থ হৃদয় খুঁড়ে এক এক করে বেদনাগুলো জাগিয়ে দিত।

**কিছুটা অভিমান হতো আল্লাহর ওপর। কেন আল্লাহ আমার সঙ্গে এমন করল? প্রেমটা হয়ে গেলে ভালোই তো হতো। আমার সঙ্গেই কেন আল্লাহ এমন করল? কী এমন পাপ করেছিলাম আমি? এত ডাকলাম আল্লাহর কাছে, এত করে চাইলাম! আল্লাহকে ডাকলে নাকি আল্লাহ সাড়া দেন। তাহলে আল্লাহ কেন আমার ডাকে সাড়া দিল না? বালিকার সাথে প্রেম হয়ে গেলে কতই না সুখে থাকতাম!**

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে থেমে গেল সোহান। ওর মুখের অভিব্যাক্তি দেখে ও কী ভাবছে তা বুঝতে পারলাম না। আমিও কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ পর সে-ই নীরবতা ভাঙলো।

‘...প্রাক্তনের সাথে কুড়ি বছর পর দেখা হলে কী হতো তা জানতে চেয়েছিল জীবন বাবু। পৃথিবীর পথে হারিয়ে যাওয়া বালিকাকে আর একটিবার দেখার ইচ্ছা ছিল আমারও। জীবন বাবুর ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। তবে আমি একদিন ঠিকই পেয়ে গেলাম তার দেখা। বিদায়ী হেমন্তের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার সন্ধিক্ষণে। ৯ বছর ৫ মাস পর। এবং এর ঠিক ২ সেকেন্ডের মাথায় এতবছর ধরে আল্লাহর প্রতি বয়ে বেড়ানো অভিমান দূর হয়ে গেল। তার সেই স্বপ্নের রাজকন্যার উগ্র পোশাক-আশাক, তথাকথিত সুশীল প্রগতিশীল আচার-আচরণ, প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষজনের সামনে হাসতে হাসতে একটা ছেলের গায়ে হেলে পড়া, ছেলেদের ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলা[৩] সবকিছুই প্রবলভাবে নাড়া দিল আমাকে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বের হয়ে অভিমান ভরা বুকে জমা হলো অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ।

আল্লাহ যে বালিকার সঙ্গে ‘ইয়ে’টা ঘটিয়ে দেননি সে কারণে ইচ্ছে করল শহরের সব রিকশার পেছনে, সব লোকাল বাসের পেছনে, ‘এখানে পোস্টার মারলে জুতার বাড়ি ফ্রি’ লেখা সব দেয়াল, সমস্ত বিলবোর্ড... সবখানে

[৩] সেই মেয়ের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলল সোহান। সেগুলো তোমাদের জানার দরকার নেই। সোহান ছোটবেলায় বিশেষ করে স্কুলে থাকতে একটু অন্যরকম ছিল। তাই তখন সেই বালিকাকে ভালো লেগেছিল। ভার্সিটি শেষ করার পর চেইঞ্জ হয়। এখন একেবারে প্র্যাক্টিসিং না হলেও মনমানসিকতা ভালো। চেষ্টা করে ইসলাম পালন করার। এ কারণে সেই মেয়ের স্বভাব চরিত্র, পোশাক-আশাক দেখে ভুল বুঝতে পারল।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আলহামদুলিল্লাহ' লিখে ভরিয়ে দিই।

আল্লাহর ওপর অভিমান করা, তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অপরাধে ভীষণভাবে লজ্জিত হলাম।

সেই বালিকার সাথে প্রেম হয়ে গেলে কী করুণ হাল যে হতো আমার, কী মাইনাকার চিপায় যে ফেঁসে যেতাম, সেটা তো আর তখন বুঝতাম না। দুআ কবুল হচ্ছে না দেখে অবুঝের মতো অভিমান করতাম, আল্লাহর সিদ্ধান্তে মন খারাপ করতাম। কিন্তু আল্লাহ, আমার রব, আমার মালিক তো জানতেন কোনটা আমার জন্য ভালো। তাই তিনি আমার জন্য ভালোটাই বেছে দিয়েছিলেন। সকল প্রশংসা আমার রবের, সাত আসমানের মালিকের, যিনি কোনোরকম স্তম্ভ ছাড়াই সেগুলো উঁচু করে রেখেছেন।'

থেমে গেল সোহান হঠাৎ করেই।

ঠিক আছে রে, আজকে আসি। বলে হনহন করে চলে গেল সে। তবে আমি এর মধ্যেই দেখে ফেলেছি, তার চোখের কোণায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু জমেছে। কৃতজ্ঞতার।

## মা পাখি

মুহাম্ম
শিক্ষার্থী, অ

পুবদিকে
ভীষণ
সব কিছু
কর

দৈত্যকার এক ঝড়ের
উঠল জেগে বনে
তাই না দেখে মা পাখি
শঙ্কা হলো মনে।

বাসায় যে তার ছোট্ট
একলা পড়ে ঘরে
থাকলে না মা পাশে
কেঁদেই যাবে মরে

ঝড়ের আগেই চলল
শিকার-ফেরত মা-
ওই তো দূরে ওই দেখ
তাদের বসত ঘাঁটি

মাকে পেয়ে খোকা
ভীষণ খুশি হলো
ডানার তলায় খুশে ম
আনন্দে ঘুম দিল

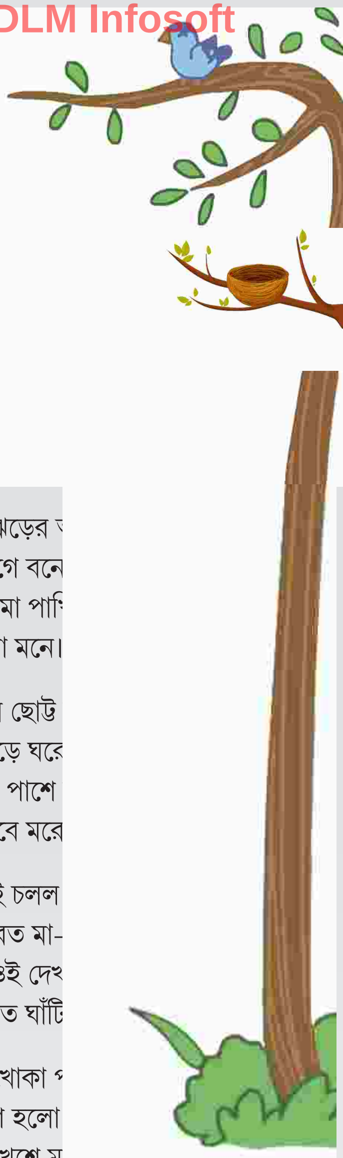

অনেক সময় অনেক কিছু ভাবি। হয় না কিছুই। না ভেবে ঝোঁকের মাথায় অনেক কাজ করে ফেলি। সব ঠিকঠাক হয়। অনেকগুলো বিন্দু দেখে ঠিকঠাক জোড়া দিয়ে স্পষ্ট সরলরেখা বানিয়ে ফেলব ভাবি। হয় না। না কি আল্লাহ চান না?

অন্য কোনো সময়, অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো স্থানে, অন্য কোনো আকাশের নিচে হয়তো বিন্দুগুলো জোড়া লাগবে, ফুটে উঠবে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে। ততদিন একটু সবর। এই তো বান্দার কাজ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজকাল তোমাদের অনেকের মুখেই একটা কথা শুনি। আমার কিছু ভালো লাগে না, পড়তে ইচ্ছে করে না, খেতে ইচ্ছে করে না, কিছু করতে ইচ্ছে করে না, এমনকি রাতে ঘুমাতেও ইচ্ছে করে না, ঘুম ধরে না। স্কুল-কলেজের গণ্ডি পার না হতেই একাকিত্ব, বিষণ্ণতা, হতাশায় আক্রান্ত হতে দেখেছি তোমাদের অনেককেই। এসব কেন হয় জানো?

অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে তোমাদের স্মার্টফোন আসক্তি। আর এই আসক্তির কারণ খেলাধুলা না করা, বাইরের পরিবেশে সময় না কাটানো।

সুস্থ থাকার জন্য, শরীরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার বিকল্প নেই। স্মার্টফোনের আনস্মার্ট আসক্তি থেকে তোমাদেরকে সুস্থ চিত্তবিনোদনের জগতে ফিরিয়ে নিতেই আমরা শুরু করছি ব্যায়াম সিরিজ। এই সিরিজে আমরা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন খেলা ও ব্যায়ামের কলাকৌশল ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ব্যায়াম সিরিজের প্রথম পর্বে আজ আলোচনা করব দড়ি লাফ খেলা নিয়ে। তোমরা এই খেলার নাম শুনেছিলে আগে? কেউ কেউ হয়তো শুনেছ। তবে খুব কমই হয়তো খেলেছ। আজকে আমরা দড়ি লাফের কলাকৌশল ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে দড়ি লাফের উপকারিতা বলি। তাহলে এর প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। এরপর এর জন্য কী কী লাগবে তা বলব।

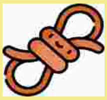

## দড়ি লাফের উপকারিতা

- টেনশন, ভয় ভীতি, হতাশা, মনখারাবি কমায়। শরীর ও মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে।
- এটি মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে, মনোবল বৃদ্ধি করে।
- দীর্ঘ পরিশ্রম করার শক্তি বৃদ্ধি করে, ক্লান্তি দূর করে।
- শরীরকে শান্ত এবং নমনীয় করে তোলে। এ কারণেই ক্রীড়াবিদেরা তাদের ওয়ার্কআউট সেশনে সব সময় এটিকে রাখেন।
- দড়ি লাফ হলো সেরা কার্ডিও ব্যায়াম। এটি হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি করে। ফলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে।
- দেহের চর্বি ঝরাতে দড়ি লাফের জুড়ি নেই।
- এটি হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। ফলে হাড়ক্ষয়ের ঝুঁকি কমে।
- ত্বক সুস্থ রাখে এবং ত্বকের লাবণ্যতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।
- দেহের রক্ত সঞ্চালন এবং শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি করে। ফলে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপকারিতা তো জানলে। এখন নিশ্চয়ই খেলতে ইচ্ছে করছে! তাহলে চলো জেনে নিই, দড়ি লাফের জন্য কী কী লাগবে এবং কীভাবে খেলবে।

## যা যা লাগবে

দড়ি লাফ খেলার জন্য একটি ভালো দড়ি হলেই হবে। পয়েন্ট টু বি নোটেড, ভালো দড়ি। টাকা বাঁচানোর জন্য সস্তা দড়ি কিনবে না।

## যেভাবে খেলবে

১. দড়ি লাফ খেলার জন্য প্রথমেই একটি নরম ও সমতল জায়গা বেছে নেবে।
২. খালি পায়ে না খেলার চেষ্টা করবে।
৩. লাফ দেওয়ার সময় পায়ের আঙুলের ওপর ভর দেবে। পুরো পায়ে ভর দেবে না। তাতে ইনজুরির সম্ভাবনা রয়েছে।
৪. প্রথমে দড়ি ছাড়াই খালি হাতে কিছুক্ষণ লাফ দিয়ে নেবে।
৫. এরপর দড়িসহ প্রথমে একবার করে লাফ দেবে। তারপর বিরতি নেবে। এভাবে কয়েকবার করার পর দুইবার করে দেবে। এরপর তিনবার করে। এভাবে লাফের সংখ্যা বাড়াবে।
৬. প্রথমে ধীরে ধীরে লাফ দিবে। অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে স্পিড বাড়াবে।

## সতর্কতা

দড়ি লাফ খেলার সময় অনেকেই কমন কিছু ভুল করে থাকে। ভুলেও এই ভুলগুলো করবে না তুমি।

১. শক্ত জায়গায় (যেমন- ফ্লোর, পাকা রাস্তা ইত্যাদি) দড়ি লাফ খেলবে না। ঘরের ভেতর খেলতে হলে অবশ্যই ফ্লোরের ওপর নরম কার্পেট বা মাদুর জাতীয় কিছু বিছিয়ে নেবে। অন্যথায় ইনজুরি হবার সম্ভাবনা আছে।
২. অবশ্যই ভালো মানের দড়ি ব্যবহার করবে। সস্তায় পাওয়া হালকা দড়ি ব্যবহার করবে না।
৩. অনেকে মাপ ছাড়াই লম্বা দড়ি ব্যবহার করে। এতে ঠিকঠাক লাফ দেওয়া যায় না। তোমার উচ্চতা অনুযায়ী সঠিক মাপের দড়ি ব্যবহার করবে। পায়ের নিচে দড়ি আটকিয়ে দড়ির হাতল দুটি বুকসমান হয় কি না দেখবে। এভাবে বুকসমান দড়িই হবে তোমার জন্য পারফেক্ট মাপের দড়ি।
৪. লাফ দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ হাত ঘুরাবে না। এতে দ্রুত ক্লান্তি চলে আসবে। তাই কনুই ও কাঁধ না ঘুরিয়ে শুধু কব্জি ঘুরাবে। এতে বেশি সময় লাফ দিতে পারবে।
৫. অনেকেই বড় বড় লাফ দেয়। এতেও দ্রুত ক্লান্তি চলে আসে। এরকম করবে না। ছোট ছোট লাফ দেবে। মাটির সাথে পায়ের দূরত্ব কম রাখবে।
৬. লাফ দেওয়ার সময় হাঁটু বেশি ভাজ করবে না। হালকা ভাজ করবে। পায়ের পাতার সামনের অংশে ভর করে লাফ দেবে।
৭. শুরুতে দুদিন দড়ি লাফ খেলার পর তৃতীয় দিন বিশ্রাম নেবে। এরপর আবার দুদিন খেলবে; পরদিন বিশ্রাম নেবে। এভাবে দড়ি খেলা চালু রাখবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫ মিনিট দড়ি লাফ খেলবে।
৮. দড়ি লাফ শেখার জন্য দেখতে পারো এই টিউটোরিয়াল দুটি-
   - https://tinyurl.com/DoriLaaf1
   - https://tinyurl.com/DoriLaaf2

এই ছিল দড়ি লাফ খেলার ব্যাকরণ। মজার ব্যাপার কী জানো? দড়ি লাফ খেলার জন্য ঘরের বাইরেও যাওয়া লাগে না। তাই রোদ-বৃষ্টি-ঝড় কিংবা বাইরে যাওয়ার আলসেমি দড়ি লাফের রুটিনে বাধা হবে না। কোথাও বেড়াতে গেলেও ব্যাগে করে দড়ি নিয়ে যেতে পারবে। তাই তোমার ব্যায়ামের রুটিন কখনোই মিস হবে না।

So, কথা কী থাকল? খেলা হবে!

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# কাক

ফাহমিদা আফরিন

মফস্বলের ভাঙাচোরা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে মিরাজ ও তার ছেলে রাজন। আজ স্কুল ছুটি থাকায় রাজন বাবার সাথে আসার সুযোগ পেয়েছে। যদিও হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও তার খুব ভালো লাগছে বাবার সাথে সারাদিন থাকতে পারবে এটা ভেবেই। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর না পেরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অগত্যা মিরাজও থেমে গেল।

কী রে বাজান, থামলি ক্যান?

করুণ চেহারায় সে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, ’আর হাঁটতে পারছি না আব্বা, পা ব্যাথা করছে।’

তাড়াতাড়ি করে জিনিসপত্র সব বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত দিয়ে রাজনকে কোলে তুলে নিলো মিরাজ। ছোট মানুষ এতক্ষণ ধরে হাঁটছে, সে কি সইতে পারে এত ধকল! নিজের ওপরই রাগ হলো মিরাজের।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা হোটেলের কাছে পৌঁছে গেল তারা। ছোট্ট রাজন খাবার জিনিস দেখে আর খিদে সইতে না পেরে বাবার কাছে আবদার করেই বসল। শুকরিয়া আল্লাহর, পকেট হাতড়ে যতটা টাকা পেল তাতে হয়তো ছেলেটার জন্য সামান্য কিছু খাবার পাওয়া যাবে।

বাপ-ছেলেতে হোটেলের দোরগোড়ায় পৌঁছুতেই তড়িঘড়ি করে ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে তাদের পথ আটকে দিল!

এই এই! তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

আমার পোলাডার খুব খিদা লাগছে ভাইজান, অয় পরোটা খাইতে চায়। এই জন্য...

মিরাজের কথা শেষ হবার আগেই নাক-মুখ কুঁচকে লোকটা চিৎকার করে উঠল।

বের হ! বের হ এখান থেকে! তোরা হোটেলে ঢুকলে আমার সব কাস্টমার হোটেলে থেকে বেরিয়ে যাবে। তোরা এখানে ঢুকতে পারবি না। যা, দূর হ!

ভাইজান এমন কইরেন না, আমার পোলাডার দিকে দেহেন, ছোট মানুষ। কতক্ষণ না খাইয়া আছে! একটু দয়া করেন।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে লোকটা রাজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাস্তার পাশের বেঞ্চের দিকে ইশারা করে বলল, ‘ঐখানে বেঞ্চ পাতা আছে, ওখানে গিয়ে বোস। আমি কাউকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। খাবার খেয়ে বিদেয় হয়ে যাবি। এখানে যেন না দেখি আর। যত্তসব নোংরা লোক!’

বিড়বিড়িয়ে আরও পাঁচ-দশটা বাজে কথা বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল লোকটা। রাজন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। মিরাজ লজ্জায় অপমানিত হয়ে মুখ নিচু করে ছিল এতক্ষণ, এখন ছেলের দিকে তাকিয়ে বড্ড খারাপ লাগছে তার।

রাস্তার ধারের গাছের নিচে বালতিটা রেখে টিউবওয়েলের পানিতে হাতমুখ ধুয়ে নিলো মিরাজ। রাজনেরও হাতমুখ ধুইয়ে নিজের ঘাড়ের গামছাটা দিয়ে যত্ন করে মুখ মুছিয়ে দিল সে। কিছুক্ষণ পর একটা ছেলে এসে বেঞ্চের ওপর প্লাস্টিকের থালায় দুটো পরোটা আর একটা প্লাস্টিকের গ্লাসে পানি দিয়ে চলে যায়। মিরাজ বুঝতে পারছে তাকে কেউই ভালো চোখে দেখছে না। একবুক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছেলেকে খাইয়ে দিতে লাগল সে।

বাবা সবটুকু তাকেই খাইয়ে দিচ্ছে দেখে রাজন বলল, ‘আব্বা, তুমি খাইবা না?’

মিরাজ হেসে বলল, ‘আমার খিদে নাই বাজান, তুই খা।’

কিন্তু তার ছেলে তো নাছোড়বান্দা। বাবার কথা সে শুনতে নারাজ। তাই নিজেই এক টুকরো পরোটা ছিঁড়ে বাবার মুখে দিয়ে দিল। বাবার কাছে এরচেয়ে শান্তির আর কিছুই নেই হয়তো। বুকটা তার ঠান্ডা হয়ে গেল শান্তিতে।

খাওয়া শেষে প্লেটের নিচে বিশ টাকা রেখে উঠে যায় মিরাজ-রাজন। গাছের নিচে বিশ্রাম নিতে বসে পড়ে তারা।

হঠাৎ একটা আহত কাক ছিটকে পড়ে গেল ঠিক ওদের কাছেই। রাজন দ্রুত কাকটাকে তুলে মিরাজের কাছে নিয়ে আসলো।

আব্বা, কাকটা কি মইরা গেল?

না রে বাজান, মরে নাই। একটু পানি দিই থাম, আজ এত্ত গরম!

মিরাজ দ্রুত কাকটার মাথায় একটু পানি দিল, রাজন আঁজলা করে পানি খাওয়াতে চেষ্টা করল তাকে। কাকটা একটু ভালো বোধ করতেই আবার উড়ে চলে গেল সেখান থেকে।

কাকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রাজন, যতক্ষণ না সে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল। বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, ‘আব্বা?’

কী রে বাজান?

**মাইনষে তো ঘরে পাখি পুষে, কত যত্ন করে। কিন্তু কাকরে দেখলেই মারে কেন? কাকও তো একটা পাখি।**

মিরাজ একটু নড়েচড়ে বসল। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে শুরু করল, ‘ছোটবেলায় যহন ইশকুলে যাইতাম, আমাদের রামু মাস্টার আমাদের পড়াইত। উনি কইতেন, কাক হইল ঝাড়ুদার পাখি।’

কথার মাঝে ফোড়ন কেটে রাজন জিজ্ঞেস করল- কাকরে ঝাড়ুদার পাখি কেন বললা, আব্বা? কাক কি ঝাড়ু দিয়া বেড়ায়?

সেইটাই বলতাছি, শোন! কাকরে ঝাড়ুদার পাখি বলে, কারণ সে পরিবেশের আবর্জনা খাইয়া পরিষ্কার কইরা ফেলে।

কাক উপকার করে, তাও মানুষ ওগো ঘেন্না করে কেন, আব্বা?

**মানুষ সুন্দরের পূজারী রে, বাজান। কাক সুন্দর হইলে তারেও মানুষে মাথায় নিয়া নাচত। কিন্তু মাইনষে কাকের উপকার বুঝে না। সব কাক মইরা গেলে যে ওগো ঘরবাড়ি ময়লার ভাগাড় হইয়া যাইব সেইটা বুঝে না মানুষে! মালিকে সবকিছুই সৃষ্টি করছে কোনো-না-কোনো কামের লাইগ্যা।**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এতক্ষণ ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে বাবার কথা শুনছিল ছোট্ট রাজন। হঠ্যাৎ সে বাবাকে বলে উঠল, 'আব্বা, তুমিও তাইলে কাক।'

কেন রে বাজান, আমারে কাক কস কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সে।

কারণ, তুমিও সব ময়লা পরিষ্কার কইরা পরিবেশ পরিষ্কার রাখো। মানুষের ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখো। তুমি কাজ না করলে তো মানুষের বাড়িঘর ভাগাড় হইয়া যাইব!

ছেলের কথা শুনে হেসে ফেলল মিরাজ। বাবার কোলে মাথা রেখে রাজন বলল- আব্বা, আমি বড় হইয়া তোমার মতো হব।

মলিন চেহারায় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল- না বাজান, তুই আমার মতো হইস না। কেউ তোরে সম্মান করব না। তুই পড়াশোনা করবি, অনেক বড় হইবি, মানুষের মতো মানুষ হইবি। আর সব মানুষকে সম্মান করবি, কাউরে তার কামের জন্য ছোট করবি না, বুঝলি বাপ?

রাজন সুবোধ বালকের মতো মাথা কাত করে সম্মতি জানাল। মিরাজ বালতি বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডান হাত দিয়ে রাজনের হাত ধরে আবারও হাঁটতে শুরু করল।

***

২০০৩ এ, ঢাবিতে হলে থাকার সময়ে মাঝেমাঝেই বিকেলবেলা স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ক্রিকেট খেলতে যেতাম। খেলা শেষ হলে প্রায়ই জগন্নাথ হলের মাঠে গিয়ে নাশতা করে মাঠে আড্ডা দেওয়া হতো। আড্ডার মাঝেই মাথায় বদ বুদ্ধি গজাত আমার। জগা বাবুর হল আর এসএম হলের মাঝের প্রেমকানন, ফুলার রোড। সেখানে সন্ধ্যা থেকে কাপল বসে থাকত।

জগন্নাথ হলের গেইটে এসে আমরা ক্রিকেট টিমের সবাই দুই ভাগে ভাগ হতাম - এক টিমে ৫/৬ জন খালি হাতে, বাকি ১২/১৩ জন স্ট্যাম্প-ব্যাট হাতে পেছনে দাঁড়াতাম। দুই টিমের মাঝে ২৫/৩০ হাত দূরত্ব নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল পর্যন্ত সামনের টিমকে নানা হুমকি-ধামকি সহকারে ধাওয়া দিতাম। শোনা যায় - চোরের মায়ের বড় গলা!

আমাদের এই ধাওয়া দেওয়ার সময় সামনের টিমকে পেটানোর চাইতে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য যে যেভাবে পারি চেচামেচি করতাম। মাঝে মাঝে ইটপাথরেও সাবধানে মিসফায়ার করতাম। আমরা নিরাপদেই এই ধাওয়া সেরে এক সাথেই গলাগলি করে জগন্নাথ হলে ফিরতাম।

রাস্তায় কাপলদের ব্যাগ, স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখা যেত। মাঝে মাঝে কিছু প্রেমিক প্রবর এসএম হলের দেয়াল টপকাতে গিয়ে আছাড় খেত। আমরা পাত্তা না দিয়ে ধাওয়া দিতাম।

**জীবনে ফোকাস ঠিক রাখা খুবই জরুরি!**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# রেসিপি

## বাটার ফ্লাই পি !

সাদিকা শারমিন

বাড়ির পাশের ছোট্ট বাগানে অনেক রকম ফুল ফুটে আছে। কদিন যাবৎ আরও বেশি বেশি যত্ন নিচ্ছি বাগানটার। কাল আমার বান্ধবী সেঁজুতি ওর কোরিয়ান বান্ধবী চ্যাই বিন্নাকে নিয়ে আমার বাগান দেখতে আসবে। চ্যাই বিন্না বাবা-মার সঙ্গে বাংলাদেশ ঘুরতে এসেছে। অনেক কিছু দেখে ফেলেছে এর মধ্যে। মফস্বলের মধ্যবিত্ত বাংলাদেশিদের বাগান কেমন হয় তা দেখার ওর খুব শখ। তাই সেঁজুতি ওকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসছে আমাদের এই ছোট্ট মফস্বলে।

পরদিন সেঁজুতি আর বিন্না আসলো। আমি সব গাছ ঘুরে ঘুরে দেখালেও কোনায় পড়ে থাকা নীল অপরাজিতা গাছটা দেখাতে ভুলে গেলাম। বিন্না অপরাজিতা গাছ দেখে হই হই করে উঠল। ‘আরে এ যে দেখছি বাটার ফ্লাই পি! খুবই চমৎকার চা হয় এটা দিয়ে। আর এই ফুল দিয়ে ত্বকের অনেক প্রসাধনীও বানানো যায়। তোমার বাগানের সেরা গাছ এটা!’

আমি তো জানতাম, অপরাজিতা ফুলের সুবাস ছাড়া আর কোনো গুণ নেই। এখন দেখছি এটা দিয়ে চা-ও বানানো যায়। বিন্না আমাকে চা বানানোর রেসিপি বলল—

‘প্যানে ৪ কাপ পানি নিয়ে চুলায় দেবে। ফুটে উঠলে দুটো এলাচ, দুই টুকরো আদা, এক টুকরো দারুচিনি ও পাঁচটি অপরাজিতা ফুল দেবে ওই পানিতে। ফুলের নিচের সবুজ অংশ ফেলে তারপর দেবে। ৫ থেকে ৬ মিনিট ফুটাতে হবে। এরপর চুলা বন্ধ করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবে। ১৫ মিনিট পর কাপে ঢেলে মধু মিশিয়ে পরিবেশন করতে পারো। চিনি না দেওয়াই ভালো। লেবু মিশিয়ে নিতে পারো খাওয়ার আগে। লেবুর রস মেশালে এই চা রঙ বদলে বেগুনি হয়ে যাবে।’

ওরা চলে যাবার পর অপরাজিতা ফুলের চায়ের উপকারিতা জানতে গুগলে সার্চ করলাম। যা যা পেলাম :

**অপরাজিতা ফুলের চা—**

- ➪ চেহারায় বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না
- ➪ স্মৃতিশক্তি বাড়ায়
- ➪ হতাশা দূর করে
- ➪ ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করে
- ➪ ক্লান্তি দূর করে
- ➪ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- ➪ বমিবমি ভাব দূর করে
- ➪ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
- ➪ ক্যান্সার প্রতিরোধক
- ➪ লিভার সুরক্ষিত রাখে
- ➪ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে

সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন থেকে নিয়মিত অপরাজিতা ফুলের চা খাব। আর বাসায় কোনো মেহমান আসলে তো অবশ্যই অপরাজিতা ফুলের চা খাওয়াব। স্বচ্ছ কাচের কাপে অপরাজিতা ফুলের নীল চা! দুর্দান্ত আপ্যায়ন হবে, তাই না?

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(৩য় পর্ব)

# সেন্টমার্টিনের অজানা ইতিহাস

## আমাদের মাঝিবা ও হুমায়ুন আহমেদ !

তৈয়ব উল্লাহ, সেন্টমার্টিন দ্বীপবাসী

নব্বইয়ের দশক। হুমায়ুন আহমেদ তখন তুমুল জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। উপন্যাস কিংবা নাটক তার সবই ভিন্ন একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করে। তার কিছু উপন্যাসের কারণেই মূলত সেন্টমার্টিন দ্বীপে পর্যটনের দুয়ার খুলে যায়। হুমায়ুন আহমেদের সেন্টমার্টিনে একটা বাড়ি আছে। নাম 'সমুদ্র বিলাস'! ১৯৯২ সালে বাড়িটি বানিয়েছিলেন তিনি।

নব্বইয়ের মাঝামাঝি শীত মৌসুমে হুমায়ুন আহমেদ একবার তার বাড়িতে আসেন। সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০-৫০ জন ছাত্র। তখন সেন্টমার্টিনে কোনো জেটি ছিল না। মানুষজন ট্রলার থেকে এক বা দুই টাকা দিয়ে কুলির কাঁধে চড়ে উঠানামা করত।

তার সাথে আসা টিমের অনেক মালামাল ছিল। একটা ৫০ জনের পিকনিক করার যা যা প্রয়োজন সবই এনেছে তারা। তখন মালামাল বহনের একমাত্র মাধ্যম ছিল ঠেলাগাড়ি। লেবার দিয়ে মালামাল নামিয়ে ঠেলা গাড়িতে উঠাচ্ছিল তারা। খাসি, চাউল, লাকড়ি, তেল, মসলা, হাড়ি পাতিল ইত্যাদি। নামাতে নামাতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। হঠাৎ লেবাররা সন্দেহজনক কিছু বস্তা নিয়ে আপত্তি তোলে। এগুলো তারা নামাতে অস্বীকৃতি জানায়।

ঘাটে থাকা ছাত্রদের চাপে পড়ে লেবাররা ঐ বস্তাগুলো ট্রলার থেকে ঠেলাগাড়িতে তোলে। আর খবরটা বড় মসজিদে পাঠিয়ে দেয়। মাঝিবা মাগরিবের নামাজের পর মুসল্লিদের বিষয়টি

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবহিত করেন। ফলে পুরো এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। এলাকার মুরব্বি ও সমাজ কমিটি জরুরি বৈঠক করেন। সিদ্ধান্ত হয়, ঐ ঠেলাগাড়ি তল্লাশি করা হবে।

মাঝিবার পরিচয় তো তোমাদের দেওয়া হয়নি মনে হয়। মাঝিবার আসল নাম মৌলভি আব্দুর রহিম (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর ওলি, দ্বীনদার আলিম ও সমাজ সংস্কারক। উনাকে সবাই মাঝিবা (মেজো আব্বা) বলে ডাকত।

**দ্বীপের সাধারণ মানুষ পাপ বা অন্যায় করার আগে আল্লাহর ভয়ের পরে মাঝিবাকে ভয় পেত। মাদক, ব্যভিচার, জুলুম, যিনা, তালাক, পরকীয়া, চুরি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখার মতো সক্রিয় ছিলেন আমাদের মাঝিবা।**

ছাত্রদের বাধায় বড় মসজিদের সামনে ঠেলাগাড়ি তল্লাশি সম্ভব হয়নি। তারা মুরব্বিদের সাথে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করে এক প্রকার জোর করে ঠেলাগাড়ি নিয়ে চলে যায়।

খবরটা নিমেষেই পুরো দ্বীপে জানাজানি হয়ে যায়। দ্বীপবাসী ঢলের মতো মসজিদে আসতে থাকে। ঠেলাগাড়িটি ওয়াপদা পার হয়ে লাইটহাউজ পর্যন্ত পোঁছায়। ততক্ষণে জনতার মিছিল ঠেলাগাড়িকে ধাওয়া শুরু করেছে।

ছাত্ররা প্রথমে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও পরে দ্বীপবাসীর বিক্ষুব্ধ অবস্থা দেখে যে যার মতো পালিয়ে যায়। আশেপাশের ঘরবাড়িগুলো ছাত্রদের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহিলারা তাদের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে দেয় যাতে ক্ষুব্ধ কেউ ছাত্রদের মারতে না পারে। দ্বীপের সৌন্দর্য এটাই, এক পক্ষ ক্ষুব্ধ হলে, তাদের মধ্যেই আরেকপক্ষ মমতার চাদর বিছিয়ে দেয়!

সমুদ্র বিলাসে এ খবর পৌঁছার সাথে সাথে হুমায়ুন আহমেদ সমুদ্র বিলাসে থাকা ছাত্রদের দ্রুত মানুষের ঘরে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ তিনি জানতেন দ্বীপের মহিলারা অনেক মানবিক ও শান্ত স্বভাবের। স্যার নিজে উত্তর বিচ দিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে চলে আসেন এবং ঢাকায় যোগাযোগ করেন। কক্সবাজার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ফাঁড়িতে কল দিয়ে তাদের সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেন।

কিন্তু হুমায়ুন আহমেদ ও দারোগা সাহেব জানেন ফাঁড়ির পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সব সদস্য মিলিয়েও ক্ষুব্ধ দ্বীপবাসীর সামনে কিচ্ছু করতে পারবে না। হুমায়ুন স্যার ও ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলোচনা করলেন দ্বীপের সবার সাথে কথা বলা সম্ভব না। চেয়ারম্যান মেম্বার দিয়েও কাজ হবে না। বরং দ্বীপের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুর রহিম আলীর সাথে কথা বলতে হবে।

এশার নামাজের পর মাঝিবা, পুলিশ কর্মকর্তা ও হুমায়ুন আহমেদ একসাথে বসে এ সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।

একপ্রকার আপস রফা হয়। যা হবার সকালে হবে। দ্বীপের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে যা প্রয়োজন সবই করার প্রতিশ্রুতি দেন ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও হুমায়ুন আহমেদ।

**রাতে মসজিদের মাইকে এলান হলো, সকালে বিচার হবে। রাতে যেন কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের না-মারে বা ক্ষতি না-করে। ছাত্ররা যাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে তারা যেন তাদের নিরাপত্তা দেয়।**

সকাল হলো। বাজারে এক শালিসি বৈঠক শুরু হলো। মাঝিবা, অন্যান্য ময়-মুরুব্বি, পুলিশ, হুমায়ুন আহমেদ সবাই বসলেন।

দ্বীপের মানুষ বৈঠক স্থলে থইথই করছে। কী সিদ্ধান্ত আসে সেটা নিয়ে চরম কৌতুহল সবার।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্দেহজনক বস্তাগুলো খোলা হলো। সব গুলো মদ! মদের বোতলের চ্যাং চ্যাং শব্দ এলাকাবাসীর কানে যেতেই নিস্তব্ধতা নেমে এলো। দ্বীপে মাদক নিষিদ্ধ। দ্বীপের কেউ মদ খায় না, ব্যবসাও করে না। এমনকি এ মদের সাথে তারা কখনো পরিচিতও না! প্রচণ্ড বিস্মিত হয়ে সবাই হা করে দেখছে মদের বোতলগুলো। তখন দ্বীপে মাদক বলতে কয়েকজন গোপনে গাজা সেবন করে সেটাই। তারাও এক প্রকার জনবিচ্ছিন্ন ছিল।

পুলিশ অফিসার বললেন, ‘দ্বীপের মানুষকে ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য। দেশের আইন ও দ্বীপের রক্ষণশীল সমাজের ভাবাবেগে আঘাত লাগে এমন কোনো কাজ পুলিশ হতে দেবে না ইনশাআল্লাহ!’

হুমায়ুন আহমেদ বললেন, ‘আমি এ দ্বীপের বাসিন্দা! দ্বীপের মানুষকে ভালোবাসি বলেই আমি এখানে বাড়ি করেছি। আমার অবসর এখানে কাটে। দ্বীপের সহজ-সরল ও ধার্মিক মানুষদের আমি অনেক ভালোবাসি। এ রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থাকে আমি সম্মান করি। তাঁদের আবেগে আঘাত করাকে আমি চরম অপছন্দ করি। কিন্তু কী আর করব, আমার অজান্তে আমার ছেলেরা এমন একটা কাজ করছে আমি নিজেও লজ্জায় পড়ে গেলাম। দ্বীপবাসীর কাছে আমি আমার ছেলেদের হয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনাদের পবিত্র দ্বীপটি অপবিত্র করতে চাওয়া চরম অন্যায়ের কাজ করেছে। ক্ষমার অযোগ্য অন্যায়। কিন্তু আপনারা আমার দিকে চেয়ে ক্ষমা করে দিন। আপনাদেরই সন্তান তারা! না বুঝে করছে!’

দ্বীপের মানুষ সবসময়ই মানবিক ও দয়াবান। দ্বীপে যদি কোনো পাপ হয় তাহলে দ্বীপ ডুবে যাবে। তাই আমরা পাপ করতে দিই না। আমরা জলে ভাসা একটা ছোট ডিঙ্গির ওপর বসবাস করি। তাই সবসময় ভয়ে থাকি যেন আল্লাহর গজব না আসে। ওরা ছোট মানুষ, ভুল করেছে। আমরাও মাফ করে দিচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন যেন না হয়, আপনি খেয়াল রাখবেন।’

**মাঝিবাকে উদ্দেশ্য করে সেদিন হুমায়ুন আহমেদ বলছিলেন, ‘আমার জীবনে অনেক নেতা ও মুরুব্বি দেখেছি। আপনার মতো দেখিনি। দ্বীপের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ সকলেই আপনাকে সম্মান করে। এরকম সর্বজনীন সম্মানিত ব্যক্তি আমি আগে দেখিনি। আপনাকে দেখলে নিজে থেকেই সম্মান চলে আসে!’**

প্রশাসন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রশাসনের বাহিরে এমন কিছু মানুষ থাকা দরকার, যাদের দ্বারা আইন ও সমাজের কল্যাণ হয়।

আমার এখনো মনে আছে। সেদিন সকলের উপস্থিতিতে মদের বোতলগুলো ভেঙ্গে ঝুড়িতে করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর উপস্থিত অনেকেই সেদিন মদের গন্ধে বমি করেছিল। কেউ কেউ মদ ভাঙ্গার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে বাড়িতে এসে গোসল করে পবিত্র হয়েছিলেন। অথচ আজ পবিত্র এ দ্বীপে ঘরে ঘরে মাদক ব্যবসায়ী বা মাদকসেবী! এখন মাদকের টাকা দিয়ে কুরবানি দেয়, তাবলীগে যায়, মসজিদে দান করে! সুন্দর সুন্দর বয়ান করে! নির্লজ্জ!

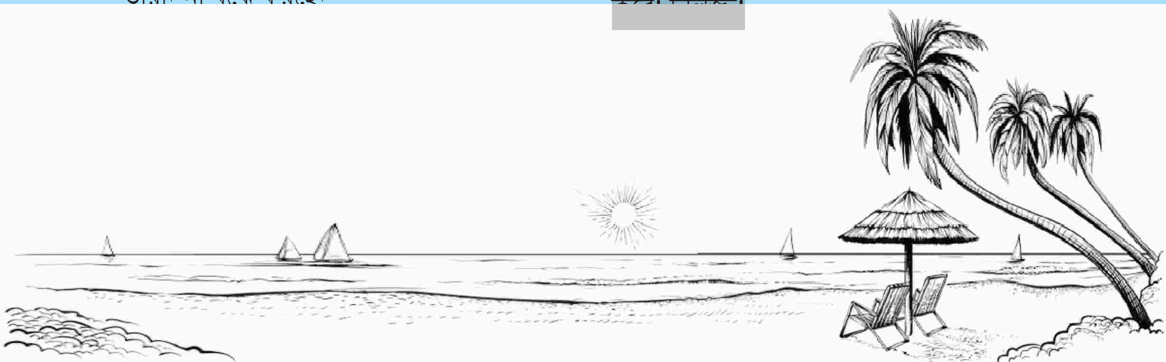

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# এ যেন পৃথিবীর বুকেই জান্নাত

রাফি বিন আমান

আজকাল মুসলিমদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় লুটেরা, উগ্র জাতি হিসেবে। ধ্বংসযজ্ঞ যাদের রক্তে মিশে রয়েছে। অথচ যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর যে ভূখণ্ডেই মুসলিমরা গিয়েছে সে ভূখণ্ডকেই সাজিয়েছে অপরূপ সাজে। মুসলিমরা সৌন্দর্যপ্রিয় জাতি। জান্নাতের বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিমরা বিশ্বের নানা স্থানেই নয়নাভিরাম বাগান তৈরি করেছে। আজকে আমরা দেখব এমনই কিছু বাগানের মনকাড়া সৌন্দর্য।

**আলকাছার সিভিলের বাগান, স্পেন**

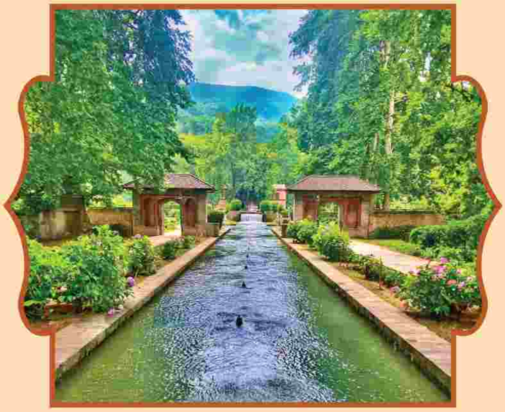

**নিশাত বাগ, জম্মু-কাশ্মীর**

**লে জারদিন সিক্রেট, মুরাকেশ, মরক্কো**

**নারেঞ্জিস্তান বাগ, ইরান**

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

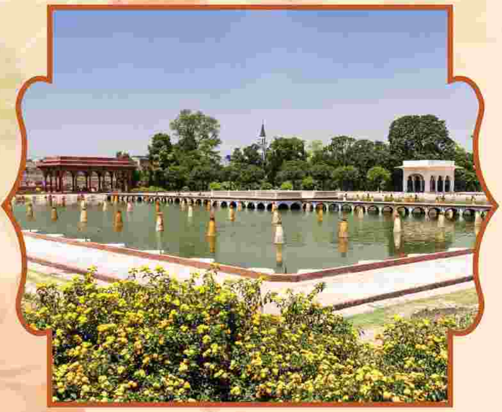

শালিমার বাগান, লাহোর, পাকিস্তান

দ্যা গ্রেট মস্ক অফ প্যারিস গার্ডেন, ফ্রান্স

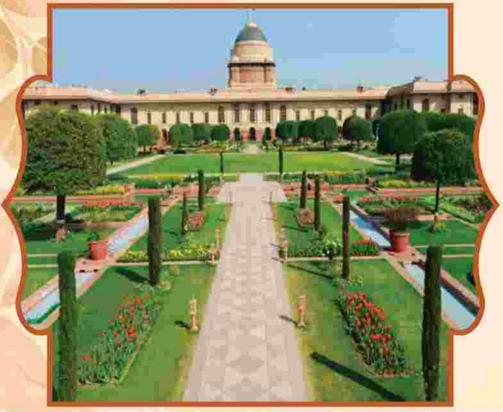

মুঘল গার্ডেন, নয়াদিল্লী, ভারত

মিসৌরি বোটানিক্যাল গার্ডেন,
আরব বাগান, আমেরিকা

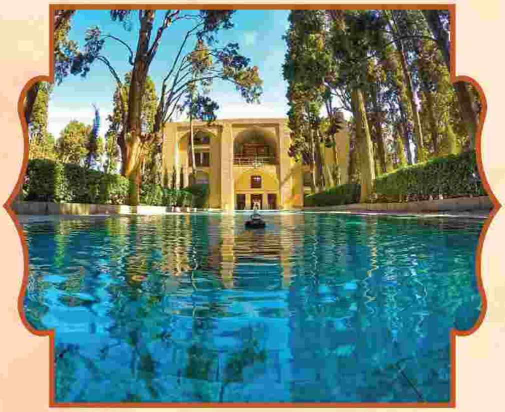

বাগ এ ফিন, ইরান

তোপকাপি প্যালেস গার্ডেন, তুরস্ক

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**দুই.**

কেন সবসময় আমার এত টেনশন হয়?[১] মানুষ আমাকে নিয়ে কী ভাববে, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে, আমার কণ্ঠস্বর কেমন শোনাচ্ছে এসব নিয়ে চিন্তা হয়?

টেনশন বা উদ্বেগ মোটের ওপর খারাপ কিছু না! হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ব্রেইনের একটা অংশ এই টেনশনের কাজ করে যাচ্ছে আমাদেরই সুরক্ষার জন্য। ধরো, খুব ব্যস্ত রাস্তা। হুশহাশ করে গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তার ওপাশে নান্না মিয়ার বিরিয়ানির দোকান। তুমি কি বিরিয়ানি খাবার নেশায় চোখ-কান বুজে বাস-ট্রাক আসছে কি আসছে না তার কোনো পরোয়া না করে রাস্তা পার হবে?

- না, কারণ ব্রেইনের ওই যে ওই টেনশন/উদ্বেগ সৃষ্টিকারী অংশ তোমার মধ্যে বাস চাপা পড়ার একটা টেনশন/ভয় তৈরি করবে। ফলে তুমি বেপরোয়া হলেও খুব বেশি ঝুঁকি না নিয়ে একটু হলেও দেখেশুনে রাস্তা পার হবে।

স্মোক (ধোঁয়া) ডিটেকটর নামে এক ধরনের ডিভাইস আছে। বাসাবাড়ি বা কারখানায় লাগানো হয় এটা। কোথাও আগুন লাগলে যে ধোঁয়া তৈরি হয়। স্মোক ডিডেক্টর এই ধোঁয়ার উপস্থিতি টের পেলেই সঙ্গে সঙ্গে এলার্ম বাজায়। সতর্ক করে দেয়। তোমার এই যে টেনশন/ভয় হয় এটাও অনেকটা ওই স্মোক ডিটেকটরের মতো। কিন্তু ধরো, রান্নাঘরে কেউ ডিম ভাজছে। অল্প একটু যে ধোঁয়া তৈরি হয়েছে আর তাতেই স্মোক ডিটেক্টর এলার্ম বাজানো শুরু করেছে। এমন হলে যেমন সমস্যা, তেমনি সবসময় সব ব্যাপারে তুমি ভয় পাচ্ছ, টেনশন করছ- এমন হলেও ব্যাপক সমস্যা। বুঝেছ?

- বুঝলাম, ভাইয়া। কিন্তু আমার স্মোক ডিটেকটর এত সেন্সিটিভ কেন? সবসময় সব ব্যাপারেই শুধু সতর্ক সংকেত পাঠায় কেন?

মোটাদাগে এর তিনটা কারণ রয়েছে। হয় তোমার টেনশন, ভয়ের পেছনে এই তিনটা কারণের সবগুলোই আছে এমন নয়। একটি থাকলেও তোমার টেনশন হতে পারে।

১। তোমার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে আসা

[১] প্রথম পর্বের লিংক - https://tinyurl.com/Mukhchora1

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিনগত বৈশিষ্ট্য- তোমার দাদা, তার দাদা বা বংশের অন্য কারও এমন টেনশন করার অভ্যাস ছিল। তার কাছ থেকেই তুমি এই স্বভাব পেয়েছ।

২। বাবা-মার আচরণ- তোমার বাবা মা কি মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করে? না কি সামাজিক উদ্বিগ্নতার কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান, দাওয়াত, মানুষদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে?

৩। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা- আমরা প্রায় প্রত্যেকেই ক্লাসে সবার সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে গিয়ে, প্রেজেন্টেশন দিতে গিয়ে বা নব্য পরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে গিয়েছি, ভুল করেছি। এমন দুঃসহ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সবারই আছে। এখনো হয়তো মাঝে মাঝে সে ঘটনাগুলো মনে হলে অসস্তি লাগে। পেটের মাঝে গুড়মুড় করে। কিন্তু সোস্যাল এংজাইটিতে ভোগা মানুষদের এই ঘটনাগুলো সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হিসেবে তাড়া করে যেন। সবসময় আতঙ্কে ভোগে। ভাবে, তারা সবার সামনে প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে, কথা বলতে গেলে আবার আগের মতোই ভুল করবে। আবার সেই ভয়াবহ লজ্জার মধ্যে পড়তে হবে। এই ভয়ে তারা কুকড়ে থাকে। সেই কাজগুলোকে এড়িয়ে চলতে আদা জল খেয়ে নামে।

***কাজ ১- তোমার বংশে কে কে এমন দুশ্চিন্তা, অপ্রয়জোনীয় লজ্জা করত, একটা নতুন ডায়েরি বা খাতাতে তার একটা লিস্ট করে ফেলো।***[২]

***কাজ ২- তোমার বাবা-মা উদ্বিগ্নতার কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান, দাওয়াত, মানুষদের সাথে মেলামেশা এড়িয়ে চলার কয়েকটি ঘটনা তোমার সেই ডায়েরিতে বিস্তারিত লিখো।***

***কাজ ৩- এমন কয়েকটি ঘটনার কথা ডায়েরিতে লিখো, যা তোমাকে ভীষণ বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল এবং তুমি এখনো ভয় পাও সে ঘটনাগুলো আবার তোমার সাথে ঘটবে।***

নার্ভাস হয়ে যাওয়া, লজ্জা পেয়ে একেবারে খোলসে ঢুকে পড়া এসবের কারণ যাই হোক না কেন, তোমার চিন্তার খুব একটা কারণ নেই। তুমি হয়তো অতীতে ফিরে গিয়ে সেই বিব্রতকর পরিস্থিতিগুলোতে সঠিক আচরণ করতে পারবে না, তোমার বাবা-মার আচরণেও তেমন পরিবর্তন আনতে পারবে না, বা বংশগতসূত্রে পাওয়া নার্ভাসনেস, টেনশন দূর করতে পারবে না। কিন্তু ঠিকই তুমি নিজেকে বদলাতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তোমার ভেতরের স্মোক ডিটেক্টরটাকে হ্যাক করে মেরামত করে নিতে পারবে, যেন ডিম ভাজির ধোঁয়ায় নয়, আগুনের ধোঁয়ায় সে সতর্ক সংকেত দিতে পারে।

## তিন.

সজীবের মাথা বেশ পরিষ্কার। টপিক যত কঠিনই হোক না কেন, সে খুব দ্রুত বুঝতে পারে। কোনো বিষয় একদম গভীরভাবে আত্মস্থ করে সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করতে পারে। কিন্তু সেও তোমার মতো অপ্রয়োজনীয় লজ্জা পায়। পেটে বোমা মারলেও মুখ দিয়ে তার কথা বের হতে চায় না।

সেদিন নুরুল হুদা স্যার পড়াচ্ছিলেন আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ। খুব দ্রুতই বুঝে ফেলল সজীব। একটা প্রশ্নও আসলো সজীবের মাথায়। বুঝানো শেষ হলে স্যারও কয়েকবার বললেন কারও কোনো প্রশ্ন থাকলে নির্ভয়ে বলো। কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। সজীবেরও বেশ কয়েকবার মনে হলো প্রশ্নটা করি। কিন্তু সে করল না। স্যার কিছুক্ষণ প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করলেন। কেউ কোনো প্রশ্ন না করায় তিনি নতুন টপিকে আলোচনা শুরু করলেন।

এখন এখানে আমরা একটু থামব। সজীবের পুরো কর্মকাণ্ড আমরা ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করব।

[২] লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। এই লেখায় লজ্জা দূর করার অর্থ এটা বোঝানো হয়নি যে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীলতা, অনাচারে লিপ্ত হতে হবে। বরং এমন কিছু অপ্রয়োজনীয় লজ্জা, যা আমাদের জ্ঞান অর্জন, সামাজিক মেলামেশা, ইতিবাচক, কল্যাণকর ব্যক্তিত্ব গঠন, আল্লাহর হুকুম মানতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে- তা দূর করার কথা বলা হয়েছে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১। প্রথমেই চলো দেখি, সজীবের ***আচরণ বা অ্যাকশন***- সজীব আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ দ্রুত বুঝে ফেলেছে। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তার ব্যাপক আগ্রহ। অনুসন্ধিৎসু মন। কিন্তু তারপরেও সে নুরুল স্যারকে তার মাথায় আসা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনি। স্যার কয়েকবার বলার পরেও চুপ করে থেকেছে। প্রশ্ন করলে সে নতুন কিছু বিষয় জানতে পারত। কিন্তু তারপরেও চুপ করে থেকেছে। কেন?

২। সজীব হয়তো উত্তর দিতে পারে- আমি আর একটু চিন্তা করলে বা ঘাঁটাঘাঁটি করলে নিজেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব, বাসায় ফিরে ভাইয়ার কাছ থেকে জেনে নেবো, অথবা ক্লাসের সময় নষ্ট না করে পরে স্যারের রুমে গিয়ে আরও ভালোমতো বুঝে নেবো। কিন্তু এগুলো কি সঠিক উত্তর? না। সঠিক উত্তর হলো- সজীব তার অপ্রয়োজনীয় লজ্জার কারণে প্রশ্ন করতে পারেনি, উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাসের সবার সামনে প্রশ্ন করতে তার মধ্যে একটা ভয়, একটা আড়ষ্টতা, একটা নার্ভাসনেস কাজ করেছে। এই ***অনুভূতিগুলোর*** কারণে সে প্রশ্ন করেনি।

৩। এখন প্রশ্ন হলো, সজীবের এই অনুভূতিগুলো কেন আসলো? সজীব কেন শুধু নুরুল স্যারের ক্লাসে না, অন্য যেকোনো ক্লাসেই প্রশ্ন করতে ভয় পায়? ক্লাসে প্রশ্ন করার সময় আসলে সজীবের মাথায় দ্রুত যে ***চিন্তাগুলো*** ঘোরাফেরা করে-

ক) ক্লাসের সবাই আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। আমার চেহারা নিয়ে কে কী ভাববে আল্লাহই জানেন। আমার চুলের স্টাইল দেখে আমাকে হয়তো ক্ষ্যাত ভাববে, আমার চেহারা, পোশাক-আশাক নিয়ে হাসাহাসি করবে। কেউ কেউ আমাকে ভেংচিও কাটতে পারে।

খ) আমি হয়তো গুছিয়ে শুদ্ধভাবে প্রশ্ন করতে পারব না। আমার গুছিয়ে কথা বলতে না পারা, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর শুনে ওরা আমাকে ক্ষ্যাত, বোকা মনে করবে। আমার আর মান সম্মান থাকবে না।

গ) আমাকে ওরা আঁতেল ভাববে। ক্লাস শেষে পঁচাবে।

ঘ) স্যার আমাকে গাধা স্টুডেন্ট মনে করবেন। এত সহজ বিষয় কেন আমি বুঝতে পারলাম না। রেগে যাবেন। বকাঝকা করবেন। বা ভাববেন, আমি ক্লাসে মনোযোগ দিইনি।

**বিব্রতবোধ**- বোকাবোকা, অপদস্থ, লাজুক/অপ্রতিভ
**উদ্বিগ্ন**- চিন্তিত, ভীত, নার্ভাস, তটস্থ
**হীনমন্যতা**- নিজেকে অপদার্থ, অযোগ্য, অনুপযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ, দৃঢ়তাহীন মনে করা
**একাকিত্ব**- ভালোবাসা বঞ্চিত, একলা, প্রত্যাখ্যাত, কেউই আমাকে চায় না এমন অনুভূতি
**নিরাশ**- হতাশ, পরাজিত, উদ্যোমহীন, ভবিষ্যৎ নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা করা
**লজ্জিত**- অনুতপ্ত, বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত, নিজেকে দোষী ভাবা
**বিষণ্ণ**- অসুখী, দুঃখিত, মনোবল হারিয়ে ফেলা
**ঈর্ষা**- হিংসুটে, অন্যদের সবসময় অবিশ্বাস করা
**বিভ্রান্ত**- দিশেহারা, শৃঙ্খলাহীন, হতবুদ্ধি, কী করতে হবে তা বুঝতে না পারা
**আহতবোধ**- ব্যথিত হওয়া, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করা, আঘাত পাওয়া
**রাগান্বিত**- বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, বিদ্বেষ, অতিষ্ঠ, ক্রুদ্ধ, উন্মাদ হয়ে যাওয়া

*চিত্র : সামাজিক পরিমন্ডলে উদ্বিগ্ন তরুণ-তরুণীদের অনুভূতিসমূহ*

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**সামাজিক পরিমন্ডলে উদ্বিগ্ন তরুণ-তরুণীদের শারীরিক লক্ষণসমূহ**

সজীবের মতো মানুষেরা সবসময় মনে করে আশেপাশের সবাই তাকে জাজ (Judge) করে। তার পোশাক-আশাক, চেহারা, আচরণ, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি নিয়ে মন্তব্য করবে, বা মনে মনে কিছু ভেবে বসে থাকবে। কে কী ভাবল বা ভাববে এই চিন্তা থেকে তাদের মধ্যে একটা ভয়, একটা বিপদের অনুভূতি তৈরি হয়। ভয় পেলে বা বিপদে পড়লে আমরা সবার প্রথমে কী করি? রাস্তার পাশে একটা সাপ দেখলে আমরা কী করি? দৌড়ে পালাই, তাই না? সেই বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করি, তাই না? এখানে বিপদ এড়ানোর উপায় হলো- প্রশ্ন থেকে পালানো, চুপ থাকা।

সজীবও এখানে তাই করেছে। সে চুপ থেকে এই তথাকথিত বিপদ থেকে বেঁচেছে। কিন্তু সে যদি এভাবে না পালিয়ে প্রশ্ন করত, তাহলে নতুন কিছু শিখতে পারত, ক্লাসের বাকিরাও শিখত। স্যার খুশি হতেন। অনেক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেত। চুপ থাকা এড়িয়ে যাওয়া ক্ষণিক সময়ের জন্য তৃপ্তিদায়ক হলেও দিনশেষে এটা তোমার ব্যর্থতার পাল্লা ভারী করবে, তোমার সম্ভাবনাগুলোকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।

তাহলে আমরা বুঝলাম সজীবের এমন প্রশ্ন না করে এড়িয়ে যাবার পেছনে ধাপে ধাপে তিনটি বিষয় কাজ করেছে।

**১। নেতিবাচক চিন্তা :** প্রথমে তার মাথায় একগাদা নেতিবাচক চিন্তা এসেছে।

**২। নেতিবাচক অনুভূতি :** এরপর সেই চিন্তাগুলোর কারণে তার মধ্যে ভয়, আড়ষ্টতা, লজ্জা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে।

**৩। কাজ/অ্যাকশন (এড়ানো) :** নেতিবাচক অনুভূতিগুলোর কারণে সে আর প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন করা এড়িয়ে গিয়েছে।

সোশ্যাল এংজাইটিতে ভোগা সব মানুষ এই প্যাটার্নেই কাজ করে। নেতিবাচক চিন্তা থেকে নেতিবাচক অনুভূতি, নেতিবাচক অনুভূতি থেকে কোনো কাজ করা এড়ানো- এই তিনটা বিষয় একসূত্রে গাঁথা। একটা চেইন দিয়ে বাঁধা যেন। একটার পর একটা অটোমেটিক চলে আসে। চেইন রিয়েকশন হয়। সোশ্যাল এংজাইটি দূর করার জন্য এই শেকল অবশ্যই ভাঙতে হবে।

চলো, সজীবের মতো আরও চারজন কিশোর-কিশোরীর গল্প শুনে আসি।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## তাসিন

তাসিনের চিন্তা, অনুভূতি এবং অ্যাকশন চেইনটা ভালোমতো বিশ্লেষণ করা যাক।

**নেতিবাচক চিন্তা-** বই নিয়ে আমি তাদের আলোচনায় অংশ নিতে পারছি না, মানে আমি একটা গাড্ডু, লুজার

**নেতিবাচক অনুভূতি-** বিব্রতবোধ করা, বন্ধুত্ব আলগা হয়ে যাবে এমন দুশ্চিন্তা করা

**কাজ/অ্যাকশন-** একদম নীরব হয়ে তাদের আলোচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া

তাসিনের মতো তুমিও কি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ? ডায়েরীতে লেখে ফেলো সেই পরিস্থিতিতে তোমার মাথায় কী চিন্তা এসেছিল, তোমার অনুভূতি কেমন ছিল এবং তুমি কী করেছিলে। ফরম্যাটটা হবে নিচের মতো।

**কাজের নাম :**

**নেতিবাচক চিন্তা :** ------------------------

**নেতিবাচক অনুভূতি :** ---------------------

**অ্যাকশন :** ------------------------------

## জাফরিন

জাফরিনের বাবা বদলি হয়ে নতুন শহরে এসেছেন। জাফরিন শহরের সবচেয়ে নামকরা গার্লস স্কুলে ভর্তি হয়েছে। টিফিন পিরিয়ডে তার ক্লাসেরই কয়েকজন মেয়ে কমনরুমে বসে গল্প করছিল। নতুন স্কুলে জাফরিনের একাকী লাগছিল। তার ইচ্ছা করছিল তাদের সাথে পরিচিত হয়ে বন্ধুত্ব করতে। তাদের সাথে কয়েকবার চোখাচোখিও হলো। কিন্তু সে তাদের কাছে যাচ্ছে না। শেষমেশ কয়েকজন মেয়ে চেয়ার থেকে উঠে তার কাছে আসলো। একজন বলল, 'কেমন আছ তুমি? স্কুলে নতুন এসেছ? চলো, আমরা পরিচিত হই। আমরা একে একে সবাই সবার নাম বলব ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো।'

সাথে সাথেই জাফরিনের মাথায় চিন্তা আসলো- আমার পালা আসলে আমি নার্ভাস হয়ে যাব। আমার গাল লাল হয়ে যাবে। সবাই বুঝে ফেলবে আমি খুবই নার্ভাস মানুষ।

জাফরিন আসলেই খুব নার্ভাস হয়ে পড়ল। সেই সাথে হলো লজ্জিত ও বিব্রত। এবং সে যা আশংকা করেছিল তাই হলো। তার গাল লাল হয়ে গেল। তোতলাতে তোতলাতে সে কোনোমতে বলল- 'আচ্ছা, আমার আমার নাম...জা...জাফরিন।'

**কাজ :** জাফরিনের চিন্তা-অনুভূতি-অ্যাকশনের চেইন রিয়েকশনটা লিখে ফেলতে পারবে না তুমি? ওপরের ফরম্যাটটার মতো করে তোমার ডায়েরীতে লিখে ফেলো।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## রিয়াদ

**কাজ :** রিয়াদের চিন্তা-অনুভূতি-অ্যাকশনের চেইন রিয়েকশনটা লিখে ফেলো তোমার ডায়েরীতে।

## রাফি

হাজী শরীয়তউল্লাহ বয়েজ স্কুলের রাফি সিঙ্গারা আর নুডুলস খাচ্ছে স্কুল গেইটের সামনের বিসমিল্লাহ হোটেলে বসে। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত সে। সকালে নাস্তা করার সময় পায়নি ইংরেজি প্রাইভেটের কারণে। গোগ্রাসে খাবারগুলো গিলতে লাগল সে। কিছুক্ষণ পরেই ফুরিয়ে গেল সিঙ্গারা আর সস। খিদে এখনো মেটেনি। আরও সিঙ্গারা আর সস লাগবে তার। ওয়েটার মামা অন্য কাস্টমারদের অর্ডার নিয়ে ব্যস্ত। ইশারা করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলো রাফি। একটু জোরে ডাক দিলেই ওয়েটার মামা শুনতে পেত। কিন্তু জোরে ডাক দিলে সবাই তার দিকে তাকাবে, তার কণ্ঠস্বর তাদের কাছে কেমন শোনাবে এসব ভেবে সাহস হচ্ছে না রাফির। লজ্জা পাচ্ছে। নিজের চেহারা, পোশাক-আশাক ইত্যাদির ব্যাপারে হীনমন্যতায় ভুগছে। শেষমেষ পেটে খিদে রেখেই উঠে গেল সে।

**কাজ :** রাফির চিন্তা-অনুভূতি-অ্যাকশনের চেইন রিয়েকশনটা লেখে ফেলো তোমার ডায়েরীতে।

সজীব, রাফি, জাফরিনদের মতো সোশ্যাল এংজাইটি থেকে তুমি কোনো কাজ করা, মানুষদের সাথে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি এড়িয়ে গিয়েছ এমন কয়েকটি ঘটনা মনে করার চেষ্টা করো। এরপর চিন্তা-অনুভূতি-অ্যাকশনের চেইন রিয়েকশন আমাদের দেওয়া ফরম্যাট অনুসারে ধাপে ধাপে লেখে ফেলো। এই কাজগুলো আশা করি খুব মনোযোগ দিয়ে করবে। কোনো সমস্যা সমাধানের আগে সেই সমস্যাটার প্রকৃতি ভালোমতো বুঝে নিতে হয়। তোমার এই বাড়ির কাজগুলো তোমাকে জানিয়ে দেবে কেন তোমার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। কাজেই ফাঁকি দিয়ো না, ভাইয়াপুরা!

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

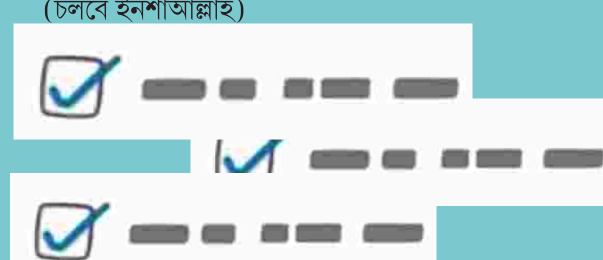

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# মদের বার থেকে মদীনায়

আয়াত

আমি ওমর (ছদ্মনাম)।[১] মিশরের নামি এক হোটেলে কাজ করতাম আমি। এখন মদীনার এক হোটেলের ম্যানেজার। আমার হোটেলটা মসজিদে নববির একেবারেই কাছে। আমাদের সবার প্রাণের চেয়ে প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে আছেন যেখানে। ইচ্ছে হলেই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদে সালাত আদায় করতে পারি। ছুটে গিয়ে বলতে পারি—আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ। মিশর থেকে মদীনায় এসে এমন সৌভাগ্যের পেছনে আমার একটা গল্প আছে। সেই গল্পটাই আজ আমি তোমাদের শোনাব।

মিশরের হোটেলে কাজ করার সময় আল্লাহর রহমতে ভালোই আয় ছিল আমার। আমার কাজে হোটেলের মালিকও খুব খুশি ছিলেন। তবে এই হোটেলে কাজ শুরু করার পর থেকেই আমার ভেতরে একটা দ্বিধা কাজ করছিল। এই হোটেলে নিয়মিত মদ্যপানের আসর বসত। আমার দায়িত্ব ছিল খদ্দেরের কাছে মদ পৌঁছে দেওয়া। বুঝতে পারছিলাম আমি পাপের সাগরে ডুবে যাচ্ছি। কিন্তু পরিবারের জন্য আমি বেশ কিছুদিন কাজটা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু প্রতিনিয়ত বিবেক আমাকে দংশন করে যাচ্ছিল। আর পারছিলাম না। শেষমেষ এক প্রকারের দিশেহারা হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম একজন বড় আলিমের কাছে যাবার।

**আমি তাঁর কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও।' তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, 'শাইখ, আমি যদি আমার এই চাকরি ছেড়ে দিই, তাহলে আমি বেকার হয়ে যাব। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারব না। আমার স্ত্রী-সন্তান খাবে কী, পরবে কী?' তিনি বললেন, 'তাহলে কি তুমি চাও আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কাজ আমি তোমাকে করতে বলি?' আমি মাথা নিচু করে রইলাম।** তিনি বললেন, 'স্মরণ করো কুরআনের সেই আয়াত,

**"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ তৈরি করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দেবেন, যা সে কল্পনাও**

[১] সত্য ঘটনা অবলম্বনে। উৎস- A TRUE STORY. THE POWER OF TAWAKKUL, quranclass.net- https://tinyurl.com/tawaqqul

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

**করতে পারবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।” (সূরা তালাক, আয়াত : ২-৩)**

তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। চাকরিটা ছেড়ে দাও।’

হোটেলে ফিরে আসলাম। সারারাত অনেক ভাবলাম। অনেক ভেবে মন শক্ত করলাম। আল্লাহ গায়ে শক্তি দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন, ইনশাআল্লাহ কোনো-না-কোনো কাজ করে সংসার চালিয়ে নিতে পারব। কিন্তু এই মদের বারে আর কাজ করব না।

পরদিন সকালে অনেক সাহস করে পদত্যাগপত্র লেখা শুরু করলাম। এমন সময় ফোন বেজে উঠল। বস ফোন করেছেন। উনি যা বললেন তা আমি নিজের কানেই শুনলাম। কিন্তু তারপরেও আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি।

‘ওমর, সুখবর আছে। তোমাকে প্রমোশন দিয়ে সৌদি আরবে বদলি করা হয়েছে। মদীনার এক হোটেলে তুমি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে। মদীনা যাবার জন্য জলদি রেডি হয়ে নাও। আর হ্যাঁ, সেই হোটেলে কিন্তু মদ বিক্রি করা হয় না।’

**আমার দুচোখে আনন্দের অশ্রু চলে আসলো। আল্লাহ এত দ্রুত আমার দুআ কবুল করবেন ভাবতেও পারিনি।**

মুসনাদু আহমাদে হুমাইদ বিন হিলাল সূত্রে এক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, ‘আমি নবিজি ﷺ -এর কাছে এলাম আর তিনি আমাকে একটি ঘর দেখিয়ে বললেন, “এই বাড়িতে এক নারী বাস করত, যে এক মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সাথে অভিযানে যায়। সে তার মালিকানাধীন বারোটি ছাগল ও কাপড় বোনার কাঁটা ঘরে রেখে যায়। এর মধ্যে একটি ছাগল ও কাঁটা হারিয়ে যায়। সে দুআ করে, হে আল্লাহ, যে আপনার রাস্তায় বের হয়, আপনি তার হিফাজতের ওয়াদা করেছেন। আমি একটি ছাগল ও কাপড় বোনার কাঁটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি আপনার কাছে মিনতি করছি তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।” রাসূল ﷺ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উদ্দেশে ওই নারীর করা দুআর গভীরতা নিয়ে মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন, “সকালে জেগে উঠে সে হারানো ছাগল ও কাঁটা ফিরে পেল এবং সেই সাথে অনুরূপ আরও পেল। যদি চাও, তাহলে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।” আমি বললাম, “আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি।”’

***

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে পাপ কাজ ত্যাগ করলে আল্লাহ এর চাইতেও উত্তম বস্তু আমাদের দান করেন। অথচ আমরা তাঁর ওপর ভরসা করতে পারি না। পরীক্ষায় নকল বা দেখাদেখি করে না লেখলে কয়টা নম্বরই না হয় কম পাব, কিন্তু হারাম কাজ করা থেকে তো বেঁচে থাকব। আমি যদি আল্লাহর জন্য হারাম কাজ ত্যাগ করি, আল্লাহ কি আমাকে উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করে দেবেন না? কোনো মেয়ে/ছেলের সাথে আমার প্রেম করতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে মোবাইলে অশ্লীল কিছু দেখতে। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে যদি হারামে না জড়াই, ব্রেকআপ করে ফেলি, তাহলে আল্লাহ কি আমাকে এদের চাইতেও উত্তম মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে দেবেন না? যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে হারাম কাজ ত্যাগ করে আল্লাহ কি তাদের পানিতে ফেলে দেন? আল্লাহর ওপর এই বিশ্বাসটুকুও কি আমাদের নেই?

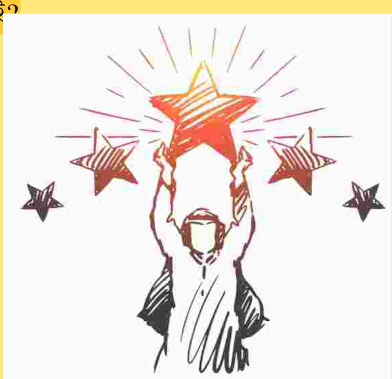

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# দুনিয়াবি পড়াশোনা কি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়?

(২য় পর্ব) লস্ট মডেস্টি

এবার আসি খ নম্বর পয়েন্টে।[১] এই আর কিছুদিন পরেই ইমাম মাহদী আসবেন। দাজ্জাল আসবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে। কাজেই এত পড়াশোনা করে কী হবে? এগুলো তো কোনো কাজেই আসবে না—তোমাদের অনেকেরই মনে এমন সংশয় কাজ করে।

এই পয়েন্ট ব্যাখ্যা করার জন্য আবারও ফিরে যাই সাহাবিদের কাছে। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাহাবিদের কিয়ামত, দাজ্জাল ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক অনেক সতর্ক করতেন। অন্যান্য ব্যাপারে সাধারণত তাঁর বক্তব্যগুলো খুব দীর্ঘ হতো না। কিন্তু দাজ্জালের ব্যাপারে তিনি দীর্ঘ বক্তব্য দিতেন। এমনকি একবার ফজরের পর বক্তব্য শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত বক্তব্য দিয়েছিলেন। মাঝে শুধু সালাতের বিরতি ছিল। সাহাবিরা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকলেন যে, আমাদের মনে হলো মদীনার খেজুর বাগানগুলোতে মনে হয় দাজ্জাল এসে লুকিয়ে আছে।'[২]

হাদীসের এই অংশে এসে আমরা একটু বিরতি নেবো। একটু গভীরভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, সাহাবিরা ভাবতেন, এই বুঝি দাজ্জাল চলে আসলো, এই বুঝি কিয়ামত হয়ে গেল। তাঁরা একটা আতঙ্কের মাঝে থাকতেন। এখন, এই অবস্থায় থাকার পরেও তাঁরা কি জীবন যাপনের জন্য জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছিলেন? ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিকাজ একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন? শারীরিক উৎকর্ষতা অর্জনের চেষ্টা বাদ দিয়েছিলেন?

তাহলে আমরা কেন এমন ভাবছি? আমরা কি সাহাবিদের চাইতেও বেশি ইসলাম বুঝে ফেললাম?

[১] প্রথম পর্ব পড়ে নাও এই লিংক থেকে- https://tinyurl.com/DuniyabiPorashona1

[২] তিরমিযি, অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান।

Compressed with PDF Compressor b

কিয়ামত কখন হবে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। আমরা কেউই এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত এটি জানতেন না। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় হয়তো কিয়ামত সন্নিকটে। দাজ্জালের আগমনও হয়তো সন্নিকটে। কিন্তু সেটা যে আগামী বছর হবে, বা আগামী পাঁচ বছরের মাঝে হবে বা আগামী দশ বছরের মাঝে হবে, সেটা কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না। ধরো, দাজ্জাল আগামী ১৫/২০ বছর পরে আসলো। তাহলে এই ২০ বছর তুমি কীভাবে পরিবারের খরচ চালাবে? পড়াশোনা কাজে লাগবে না ভালো কথা, তাহলে অন্যকিছু করো যা কাজে লাগবে। যা থেকে তুমি পরিবারের খরচ চালাতে পারবে। কিন্তু সেটা কি করছ? না কি বাপের হোটেলে খেয়ে ‘এই দাজ্জাল আসবে’, ‘এই কিয়ামত হয়ে যাবে’, ‘সব ধ্বংস হয়ে যাবে’, ‘পড়াশোনা করে লাভ নেই’—এসব বুলি আউড়ে অলসতা করে যাচ্ছ? নিজের অলসতাকে ইসলামের লেবাস পরাচ্ছ?

**একাডেমিক পড়াশোনা একেবারেই যে ইসলামের কোনো কাজে লাগে না, বিষয়টি এমন নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে যেগুলো ইসলামের খিদমতের জন্য জরুরি।**

সত্যি কথা বলতে দাজ্জাল, ইমাম মাহদী, কিয়ামত এগুলো নিয়ে আমাদের অনেকেই ফ্যান্টাসিতে ভোগে। দাজ্জাল হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফিতনাগুলোর মধ্যে একটা, দাজ্জাল আসার পূর্বে বিশ্বের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। মহামারি হবে, দুর্ভিক্ষ হবে, রক্তপাত হবে... অনেক মানুষ মারা যাবে। খুব কঠিন একটা সময় পার করতে হবে। সেই পরিস্থিতিতে ঈমানের ওপর টিকে থাকা অনেক কঠিন হবে।

এটা একটা নির্মম, নৃশংস, কঠিন বাস্তবতা। কোনো ফ্যান্টাসির বিষয় নয়। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকা, রোমান্টিসিজমে ভোগার বিষয় নয়। এই বাস্তবতাটা বুঝতে না পারলে যদি তুমি দাজ্জালের যুগ পেয়েও যাও, হয়তো দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ হিফাজত করুন।

একাডেমিক পড়াশোনা একেবারেই যে ইসলামের কোনো কাজে লাগে না, বিষয়টি এমন নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ইত্যাদি অনেক বিষয় আছে যেগুলো ইসলামের খিদমতের জন্য জরুরি। কেবল বই লিখলেই, ফেসবুকে পোস্ট দিলেই ইসলামের খিদমত হয়, আর অন্যকিছুর মাধ্যমে হয় না ব্যাপারটা তা নয়। সঠিক নিয়ত, গাইডেন্স ও পরিকল্পনার সাথে আগালে অন্যান্য বিষয়গুলো থেকেও অকল্পনীয় মাত্রায় ইসলামের খিদমত হয়।

গতানুগতিক পড়াশোনা করতে ভালো না লাগলে পড়াশোনা কোরো না। কিন্তু সময় নষ্ট না করে, অলসতা না করে, নিছক ফ্যান্টাসি আর আড্ডাবাজিতে দিন পার না করে, আয়-রোজগারের চেষ্টা করো। স্কিল অর্জন করো। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হও। পরিবারের, সমাজের বোঝা হয়ে থেকো না। ইমাম মাহদী আসলে তাঁর সাথে যোগ দেবো—এই নিয়ত রাখার পাশাপাশি তুমি দেখো তোমার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈমানের দাবি কী। সেই দাবিগুলো পূরণের চেষ্টা করো। না হলে তুমি ইমাম মাহদীর যুগ পেয়ে গেলেও তোমার নাম থাকবে বিরোধী শিবিরের তালিকায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাহবুবা উপমা

# টাইগার ফিশ

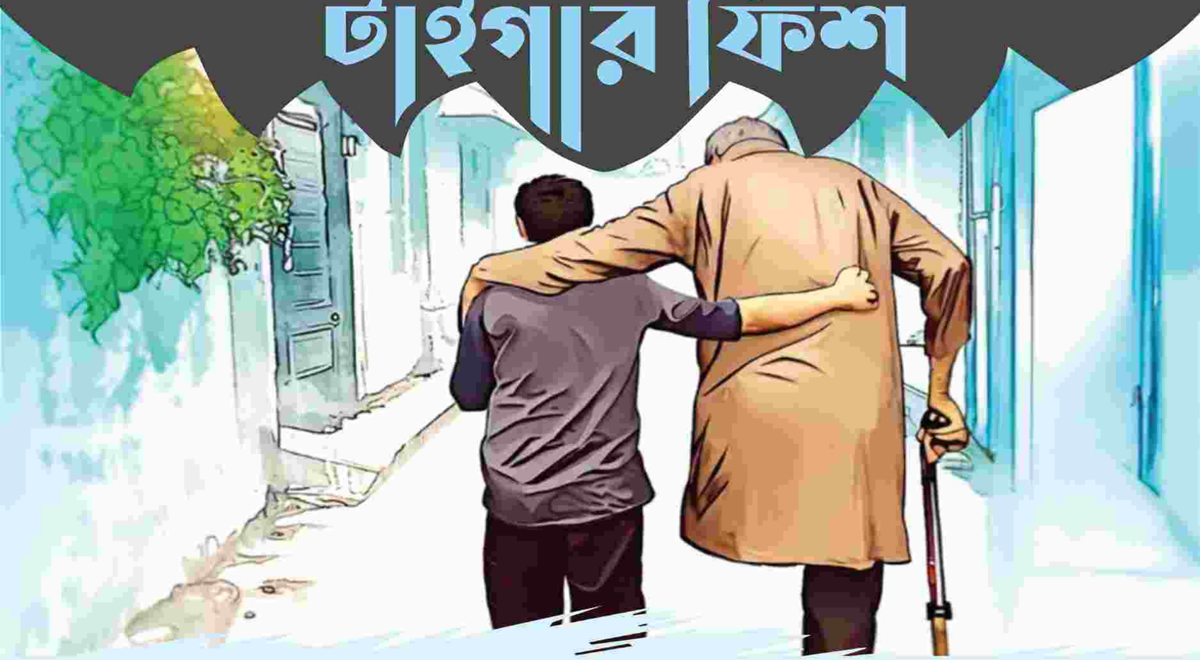

**১.**

পঞ্চাশ কিলোমিটার পাড়ি দিতে হচ্ছে। বাসে সিট জানালার পাশে হোক বা না হোক, আমার তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি শুধু চাই পাশে কোনো মহিলা বা মেয়ে না বসুক।

বাস কাউন্টারে দুই-আড়াই বছরের একটা বাচ্চা চিপস খাচ্ছে। আমার ভাগনি হাফসাও ঐ বাচ্চার বয়সী। হাফসা বেড়াতে আসলে বাসার চেহারাই পাল্টে যায়। বিছানা থেকে বালিশ নামিয়ে মেঝেতে রেখে দেবে, টেবিল থেকে বই নিয়ে আরেক রুমে রেখে আসবে, সব জিনিসের জায়গা অদলবদল করে ফেলবে। ও চলে গেলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।

**এমন সময় অনিক ভাই ফোন করলেন। সালাম দিয়ে বললেন, ‘কেমন আছো, সাদিক?’ আমি বললাম, ’আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি ভাই।’**

আমরা আগে এক সাথে আরবি শিখতাম। নতুন চাকরি পেয়ে তাকে অন্য শহরে চলে যেতে হলো। তারপর দুজনেরই ব্যস্ততার কারণে যোগাযোগে ভাটা পড়ে গিয়েছে। সালাম-কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইলেন, ‘আরবি শেখা কেমন চলছে?’

বললাম, ‘ভালোই।’

‘মাশাআল্লাহ, আর হিফজ কতদূর?’

‘ছয় পারা শেষ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।’

অনিক ভাই আমার প্রশংসা-টশংসা করে নিজের জন্য আফসোস করতে লাগলেন। আজকাল সময়ই পান না। বইপত্র পড়া হচ্ছে না আগের মতো ইত্যাদি ইত্যাদি। ততক্ষণে আমার পাশের সিটের যাত্রী চলে এসেছেন। অপরিচিত কারও সামনে ফোনে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না, বিশেষ করে বাসে। তাই আলাপের পাঠ সাঙ্গ করতে হলো।

পাশের সিটের যাত্রী সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা, মাথায় টুপি। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। বয়স পঞ্চাশের কম নাকি বেশি সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেখে বেশ শক্তসমর্থ আর সম্ভ্রান্ত মনে হয়। তবে আরেকজনের সাহায্য নিয়ে বাসে উঠেছেন। কারণ তার বাম পায়ের হাঁটুর নিচের অংশ নেই। সাথে আসা ব্যক্তিটি একটি পানির বোতল

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, 'চাচ্চু, আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি তোমার সাথে যেতে পারছি না।'

'চিন্তা কোরো না, আব্বু। আমি ঠিক পৌঁছে যাব, ইনশাআল্লাহ। আয়মান তো আছে। তুমি তাড়াতাড়ি গাড়ি ঠিক করার ব্যবস্থা করো।'

চাচার কথায় আস্বস্ত হয়ে ঐ ব্যক্তি নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো আমার আর পাশের যাত্রীর কথোপকথন। সাধারণত আমাদের সমাজে বড়রা আগে সালাম দেন না। কিন্তু আমার পাশের যাত্রী আঙ্কেল বোধহয় সওয়াব অর্জনে বেশ তৎপর। আস্তে আস্তে অনেক কথা হলো আমাদের। কম কথা বলার স্বভাব আমার। তাই কেবল উত্তরকারী হিসেবেই ভূমিকা পালন করলাম।

আঙ্কেল পেশায় ব্যবসায়ী। তার এক মেয়ে এবং এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। গতকাল স্বপরিবারে বড় ভাইয়ের বাসায় এসেছিলেন। কিন্তু হুট করে আঙ্কেলের শাশুড়ির অসুস্থতার কথা শুনে তার স্ত্রী-পুত্র রোগীকে দেখতে চলে যায়। কথা ছিল, আঙ্কেলের ভাতিজা—যিনি তাকে বাসে তুলে দিলেন—তিনি প্রাইভেট কারে আঙ্কেলকে বাসায় পৌঁছে দেবেন। কিন্তু সকালে গাড়ি গেল নষ্ট হয়ে। এদিকে আঙ্কেলের শাশুড়ি নাকি তাকে দেখতে চাচ্ছেন। তাই তাকে তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে হবে। আমার আগের স্টপেজে নামবেন তিনি।

'জানো বাবা, একটা কারণে বড্ড আফসোস হয়। মুকুট পাওয়ার লোভে নিজের ছেলেকে তো হাফিজ বানিয়েছি, কিন্তু নিজের আব্বা-আম্মার মাথায় মুকুট পরানোর ব্যবস্থা করতে পারলাম না।'

ব্যাগে একটা বই আছে। ভাবছিলাম পড়া শুরু করব। আঙ্কেলের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আজকে আর পড়া হবে না। কিন্তু তিনি যখন কথা বলতে চাচ্ছেনই তখন আমার চুপ করে থাকাটা ভালো দেখায় না। তাই বললাম, 'আপনি না বললেন, আপনার ছেলে এবার এইচএসসি দিবে? ছোটবেলায় মাদরাসায় পড়েছিল নাকি?

'একজন উস্তায বাসায় এসে পড়াতেন।'

**আঙ্কেলের পায়ের এই অবস্থা নিয়ে মনের ভেতর এক ধরনের কৌতূহল কাজ করছে। জিজ্ঞেস করা আদবের খেলাফ হয়ে যায় কিনা—এই ভেবে চুপ করে আছি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে আঙ্কেল নিজেই সেই বিষয় টেনে আনলেন। যা শুনলাম তা রীতিমতো ভয়াবহ ও রোমাঞ্চকর!**

## ২.

'বুঝলে বাবা, আল্লাহ মাঝে মাঝে বিপদকে নিয়ামত বানিয়ে দেন। এই আমার কথাই ধরো না। আজকে আমাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে হাঁটা-চলা করতে হয়। তবুও আমি মাসজিদে নামাজ পড়তে যাই। পা থাকাকালে জুমুআর নামাজটাও পড়া হতো না। এক পা নিয়ে আল্লাহ আমাকে কত কিছু দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।'

সংকোচ দূর করে আমি এবার জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'আঙ্কেল, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনার পায়ের এই অবস্থা—এক্সিডেন্টটা কীভাবে হলো?'

'সে অনেক লম্বা কাহিনি, বাবা। লোকে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে পা হারায়। আর আমি...! আল্লাহ আমার পাকে মাছের খাদ্য বানিয়েছেন।'

'কী! মাছের খাদ্য! হাঙর-টাঙর ছিল নাকি?'

'না, হাঙর নয়। হাঙরের মতো দেখতে। টাইগার ফিশ।'

'পিরানহার নাম শুনেছি। এই মাছের নাম প্রথম শুনলাম। কোথায় ঘটেছিল ঘটনাটা?'

'আমাদের এদিকে সে মাছ নেই। এশিয়াতেই পাওয়া যায় না, ইউরোপ-আমেরিকাতেও নয়। আফ্রিকার মাছ এটা। আবার আফ্রিকার সব জায়গাতেও এই মাছ থাকে না। কঙ্গো নদী, লুলাভা নদী আর টাঙ্গানিকা নদীতে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মাছের একেকটা তোমার আমার চেয়েও বড়। লম্বায় ৬ থেকে ৭ ফুট। ওজনও প্রায় ৫০ কেজি।'

'সুবহানাল্লাহ! পৃথিবীতে আল্লাহর কত রকমের

Compressed with PDF Com

সৃষ্টি আছে। এই মাছের গায়ে বাঘের মতো ডোরাকাটা দাগ আছে নাকি?'

'না, ডোরাকাটা দাগ নেই। তবে বাঘের মতো ৩২টি দাঁত আছে। বাঘের মতো চেহারা না হলেও বাঘের মতো আক্রমণাত্মক। বাঘ যেভাবে ঘাপটি মেরে বসে থাকে আর শিকার দেখলে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে, টাইগার ফিশও এভাবে শিকার ধরে।'

টাইগার ফিশের কথা আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আঙ্কেল, আপনি আফ্রিকা গিয়েছিলেন? দারুণ ব্যাপার! আমি আফ্রিকার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি। রহস্যময় বন-জঙ্গল! আপনার কেমন লেগেছে? আপনি কেন আফ্রিকায় গেলেন, জানতে পারলে খুব ভালো লাগত!'

**টাইগার ফিশের কথা আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আঙ্কেল, আপনি আফ্রিকা গিয়েছিলেন? দারুণ ব্যাপার! আমি আফ্রিকার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি। রহস্যময় বন-জঙ্গল! আপনার কেমন লেগেছে? আপনি কেন আফ্রিকায় গেলেন, জানতে পারলে খুব ভালো লাগত!'**

মুচকি হেসে আঙ্কেল বললেন, 'ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফার ছিলাম।'

আমি তো অবাক। 'মাশাআল্লাহ। এটা তো এক সময় আমার স্বপ্ন ছিল।'

আঙ্কেল আবার হাসলেন। 'তাই নাকি! হ্যাঁ, অনেক ছেলেরই এমন স্বপ্ন থাকে। খুব কম জনেরই পূরণ হয়। আমাদের সময় তো আরও কঠিন ছিল। আল্লাহ তাআলা আমার ইচ্ছেটা পূরণ করেছেন।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমাকে সবটা বলি, কী বলো?'

'নিশ্চয়ই। আমারও খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'আমাদের বাড়িতে সবাই পড়ুয়া স্বভাবের। দেশি-বিদেশি অনেক বই, ম্যাগাজিন থাকত আমাদের লাইব্রেরিতে। বইতে থাকা জীবজন্তুর ছবিগুলো আমাকে বেশ টানত। বন-জঙ্গল এসবের প্রতিও ছিল প্রবল আকর্ষণ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার আব্বাকে যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ দিয়েছিলেন। অর্থ আর মন - দুদিক থেকেই ধনী ছিলেন তিনি। ইন্টারমিডিয়েটের পর বিদেশে ডাক্তারি পড়ার জন্য পাঠানো হলো আমাকে। বছর দুই ভালোভাবেই চলল পড়াশোনা। এরপর দেখা হলো জোনাথনের সাথে। সংক্ষেপে জন নামে ডাকত সবাই। জনের সাথে দেখা হওয়া... সে আরেক কাহিনি। তোমার শোনার প্রয়োজন নেই। যা হোক, জন ছিল প্রফেশনাল ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফার। সে-ই আমার সুপ্ত ইচ্ছাটাকে জাগিয়ে তুলেছিল।'

আমি বললাম, 'তার মানে এই জনের সাথে আপনি আফ্রিকা চলে গেলেন? বাড়ি থেকে কোনো ঝামেলা করল না?'

'প্রথম প্রথম মানা করেছিল। তবে আমার জেদের কাছে টিকতে পারেনি। জন বলতে গেলে একেবারে ব্রেইন ওয়াশ করেছিল আমার। মনে হচ্ছিল, জন্তু-জানোয়ারের ছবি তোলার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে। ও একটা ভালো ম্যাগাজিনের হয়ে কাজ করত। দেখলাম, ভালোই পয়সাকড়ি কামায়। তাই অর্থচিন্তাটা মাথায় আসেনি তখন। তাছাড়া চাকরি না করলে আব্বার ব্যবসায় যোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল, যেটা এখন করছি। তাই পরে কেউ আর আটকাল না।'

এমন সময় আম্মার কল আসলো। কথা শেষ হলে আঙ্কেলের কাছে তার আফ্রিকা ভ্রমণ আর ফটোগ্রাফির অভিজ্ঞতা শুনলাম। আমি যেমন বনেজঙ্গলে ফটোগ্রাফির স্বপ্ন দেখতাম তাঁর জীবনটা তেমনই ছিল। অনেক দিন ধরে একদল প্রাণীর ওপর নজর রাখা, মুহূর্তে মুহূর্তে ছবি তোলা। সিংহ, বন্য শূকর, ভালুক, সাপসহ নাম জানা-অজানা বিষাক্ত আর হিংস্র প্রাণীর কাছাকাছি বসবাস করা। একই সাথে অনিরাপত্তা আর নেশার মিশ্রণ।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'তারপর একদিন, স্বপ্নময় দিনগুলোর পরে চলে এলো দুঃস্বপ্নের দিন। সেবার আমাদের টিমের ওপর টাইগার ফিশের ছবি তোলার দায়িত্ব পড়েছে। কঙ্গোতে চলে এলাম সবাই। টাইগার ফিশ খুব হিংস্র আর রাক্ষুসে, কুমিরকে পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। কিন্তু আমরা তো পানিতে না নেমে ওপর থেকে ছবি তুলব, তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম। টাইগার ফিশ কখনো দলবেঁধে থাকে, কখনো একা একা। আমরা কদিন ধরে একটা দলের ওপর নজর রাখছিলাম। এখনকার মতো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় সে যুগে ফটোগ্রাফারদের কয়েকগুণ খাটতে হতো। একদিন আমার এক সাথি ডাঙায় নিরাপদ দূরত্ব থেকে দলটার ছবি তুলছিল। ডাঙা থেকে একটা মাত্র মাছ দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি করলাম কী—দূরবীন নিয়ে নদীর পাড়ের একটা গাছে ওঠে গেলাম, ভালো করে দেখার জন্য। গাছ বেয়ে একটা ডালে ডান পা রাখলাম, এরপর বা পা দিতেই ডাল ভেঙে পানিতে পড়ে গেলাম। চিন্তাই করিনি গাছের ডাল এত হালকা হবে। ভয়ংকর কথা হলো, আমরা উপর থেকে একটা মাত্র মাছ দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু ওরা ছিল একটা দল। পড়া মাত্রই আমি পড়িমড়ি করে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করলাম। ওরা বুঝতে পেরে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। তবে একজন ছাড়া কেউ পারল না। সে সম্ভবত পানির নিচ থেকে বাম পা'টাকে টার্গেট করেছিল। ডাঙা কাছেই ছিল, পাড়ে প্রায় উঠেই পড়েছি এই সময় একের পর এক এমন কামড় বসালো পায়ে। চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসলো। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, টেনে পানিতে নিয়ে যেতে চাইছিল। আমার আর আমার কলিগদের সাথে পেরে উঠেনি।'

মাছের কামড় কেমন লাগতে পারে ভেবে গলা শুকিয়ে আসছে। আমার কাছে পানির বোতল নেই। আঙ্কেলের কাছ থেকে পানির বোতলটা চাইতে হবে।

৩.

কিলোমিটার স্টোনে দেখলাম আঙ্কেলের গন্তব্য আর ৫ কিলোমিটার। সময় কম বুঝতে পেরে আঙ্কেল বললেন, 'কত কথা হলো। অথচ তোমার নামটাই এখনো জানা হলো না।'

আমি বললাম, 'আমার নাম সাদিক হাসান।'

এরপর আঙ্কেল বললেন, 'বুঝলে বাবা সাদিক, তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি তুমি বেশ ইলমের অধিকারী, আমলদার ছেলে। ব্যস্ততা আর অসুস্থতার ধকলে আমি নামাজ ছাড়া অন্য আমল খুব একটা করতে পারি না। তুমি এখন তরুণ। আমল করার সামর্থ্য আছে। দুআ করি, কিয়ামতের দিন যেন আরশের ছায়া পাও। আমার জন্য দুআ করবে। ইলম-আমল কিছুই তো আমার নেই। তার ওপর সারা জীবন তো ছবি তুলে বেড়িয়েছি। খুব ভয় লাগে।'[১]

**আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। প্রথম প্রথম বেশি কথা বলার জন্য আঙ্কেলের ওপর বিরক্ত হচ্ছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আরও কিছুক্ষণ যদি তিনি থাকতেন! তাঁর কথা যত শুনছি তত মুগ্ধ হচ্ছি। মানুষটা কত অসাধারণ, অথচ নিজেকে কত সাধারণভাবে প্রকাশ করেন।** তিনি যদি আমাকে কোনো উপদেশ দেন তাহলে খুব ভালো হয়। দেরি না করে বলে ফেললাম, 'আঙ্কেল, দুআ করি আল্লাহ যেন আপনাকে বিনা হিসেবে জান্নাত দান করেন। একটু পরেই আপনি নেমে পড়বেন। তার আগে আমাকে যদি একটু নসীহত করতেন, খুব খুশি হতাম।'

'তোমাকে আর কী নসীহত করব! এই বয়সের ছেলেরা কত আজেবাজে কাজ করে বেড়ায়। আর তুমি আল্লাহর ইবাদত করছ। তবে একটা কথা বলতে পারি। নিজের মনে উজবকে জায়গা দিয়ো

[১] জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত মানুষ বা প্রাণীর ছবি তোলা জায়েজ নয়। কেবল একান্ত প্রয়োজনেই সেটি জায়েজ। যেমন-পরিচয় প্রমাণ করার জন্য বা পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য, বা অপরাধীদের ছবি তোলা এবং অন্যান্য বৈধ উদ্দেশ্যে ছবি তোলা জায়েজ। শুধু স্মৃতির প্রয়োজনে ছবি তোলা জায়েজ নয় এবং তা সংরক্ষণ করাও জায়েজ নয়, যেমনটা অনেকে করে থাকে। বিস্তারিত - https://islamqa.info/en/95322

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না।'

উজব মানে কী, বুঝতে পারলাম না। আঙ্কেলকে বললাম, 'আঙ্কেল, আপনি আমাকে যতটা মনে করছেন ততটা ইলম-আমলের অধিকারী আমি নই। এই দেখুন না, উজব মানে কী সেটাই জানি না।'

আঙ্কেল বললেন, 'এটা কোনো ব্যাপার না। তোমার মতো বয়সে তো আমি কিছুই জানতাম না। যাহোক, উজব মানে হলো আত্মতৃপ্তি, নিজেকে বড় মনে করা। অহংকার আর উজব কিন্তু এক নয়। অহংকার মানুষ অন্যের সামনে করে। আর উজব জায়গা নেয় মনের ভেতর। দেখো, শয়তান একেকজনকে একেকভাবে ধোঁকা দেয়। তোমার দ্বারা যখন গুনাহ করাতে পারছে না, তখন তোমার মনের ভেতর এমন আত্মতুষ্টি তৈরি করতে চাইবে—আমি তো অনেক ভালো, অনেক আমল করি, অমুক তমুক আমার চেয়ে পিছিয়ে। এমন চিন্তা মনের ভেতর আসতে দিয়ো না। তুমি নিজেকে যত বড় আমলদার ভাবো, আল্লাহ তো জানেনই তুমি কেমন–ভালো নাকি খারাপ। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের আমলে খুশি হলো, সে আসলে তার ঐ আমল ধ্বংস করে দিল।" বুঝেছ?'

'জি, মেনে চলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। দুআ করবেন।'

আঙ্কেল বাস থেকে নেমে পড়লেন। জানালা দিয়ে দেখলাম, ১৭-১৮ বছর বয়সী একটা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছেন তিনি। এই ছেলেটা নিশ্চয়ই আঙ্কেলের ছেলে। বাবা ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে হাটছে, কী যেন বলছে আর দুজনে হাসছে—খুব সুন্দর একটি দৃশ্য। এমন দৃশ্য আজকাল চোখেই পড়ে না। পিচ্চিদেরকে বাবার হাত ধরে ঘুরতে দেখা যায় বটে, কিশোর-তরুণদেরকে বাবার সাথে হাসিমুখে দেখাটা বিরল। এক মুহূর্তের জন্য নিজের বাবাকে বড্ড মিস করছি!

## আর হেলা নয়

ইসরাত জাহান আশরাফি
অনার্স ২য় বর্ষ, রাজশাহী কলেজ

আজ বাবা বলেছেন মাঠে গিয়ে খেলতে
বল হাতে সা'দ হাঁটে হেলতে দুলতে।
মা খুব ভয় পায়, একদমই ছাড়ে না
সা'দ বুঝি একা একা মাঠে যেতে পারে না।

বড় মাঠে একদিকে সবে মিলে খেলছে
বিকেলের সূর্যটা দূরে থেকে জ্বলছে।
প্রতিবেশি মাহাদি, সহপাঠী তাসকিন
আরও আছে অনেকে, বন্ধু আরেফিন।

সবে মিলে মজা করে খেলবে যে ফুটবল
তিনে তিনে ভাগ করে হলো তারা দুইদল।
হই হই খেলা করে মাঠ জুড়ে ওরা সব
নীরবতা ভেঙে দেয় শিশুদের কলরব।

"সা'দ সা'দ এইদিকে, গোল হবে এইবার"
মাহাদি তো বেশ খুশি, চিন্তিত সানোয়ার।
হুট করে ভেসে এলো নামাজের পয়গাম
"আজ আর খেলব না, এইবার সবে থাম।"

সা'দের কথা শুনে মাহাদি তো ক্ষুণ্ণ
"একটা তো গোল হোক, দুই দলই শূন্য।
আরেকটু পরে যাই নামাজটা পড়তে
কতক্ষণ লাগে আর এক গোল করতে?"

"না ভাই মাহাদি, ও কথাটি বোলো না
আযানের পর বেশি দেরি করা ভালো না।
শয়তান নানা কাজে আমাদের রুখবে
তাই দ্রুত ওযু করে মসজিদে ঢুকবে।

আযানের পরপরই
নিয়মিত নামাজের
বল রেখে ওরা সবে
শয়তান কেঁদেকেটে

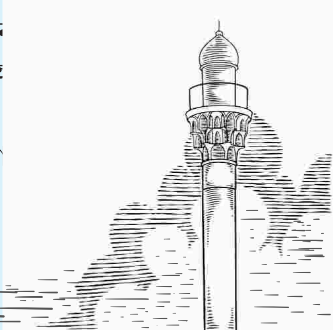

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করব? (৩য় পর্ব)

আরিফুল ইসলাম

**ষোলোর** আগের দুটি সংখ্যায় (৩য় এবং ৪র্থ) অর্থনৈতিক মুক্তি বিষয়ক দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[১] সেখানে পার্সোনাল ফাইন্যান্স বিষয়ে বেসিক কিছু আলোচনা করেছিলাম। প্রথম পর্বে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, ছাত্রবস্থায় কী কী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা উচিত, এসেট, লাইয়াবিলিটি ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিয়েছিলাম। দ্বিতীয় পর্বে ব্যাখ্যা করেছিলাম ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাশফ্লো সম্পর্কে। কেন ধনীরা আরও ধনী হয়, গরিবরা আরও গরিব হয় এবং মধ্যবিত্তরা সারাজীবন স্ট্রাগল করে। তোমরা আগ্রহী হলে আগের সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করে পড়তে পারো।

[১] প্রথম পর্ব পড়ে নাও এই লিংক থেকে - https://tinyurl.com/financialfreedom01
দ্বিতীয় পর্ব পড়ে নাও এই লিংক থেকে - https://tinyurl.com/financialfreedom02

## পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি; আসলেই কি তাই?

ছোটবেলা থেকে একটি কথা সব সময় শুনে আসছি—পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। এখন বেশি বেশি পরিশ্রম করো, পরবর্তীকালে আরাম করতে পারবে—এ কথা আংশিক সত্যি হলেও অনেক ফাঁকফোকর রয়েছে। যেমন ধরো, রিক্সাওয়ালা কিংবা দিনমজুর- ওরা কি কম পরিশ্রম করে? কিন্তু ওদের আর্থিক অবস্থা কেন পরিবর্তন হচ্ছে না। কারণ আমাদের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এমনই। এখানে গরিব থেকে সাচ্ছন্দ হওয়ার সহজ কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের যেটা করতে হবে- **"Work smarter, not harder".**

কীভাবে স্মার্ট ওয়ার্ক করব? সহজভাবে বললে, তোমাকে অল্প সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা শিখতে হবে। সস্তা কাজে সারাদিন ব্যয় করলে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেটির ভ্যালু খুব সামান্য। বরং যে মূল্যবান, সবাই সহজে যেটি পারে না, নিজেকে ওই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। ধরো, তোমাকে এসাইনমেন্ট দেওয়া হলো একটি বিজনেস প্রপোজাল তৈরি করে আনতে। তুমি তিনদিন সময় লাগিয়ে ১০ পৃষ্ঠার একটি প্রপোজাল তৈরি করলে। অথচ, তোমার বন্ধু ChatGPT দিয়ে একটি প্রপোজাল বানিয়ে, একটু কাটঁসাটঁ করে এক ঘণ্টায় সেই কাজটি করে দিল। কে বেশি স্মার্ট?

## বেশি বেশি ইনকাম করো, ব্যাংকে টাকা জমাও তারপর আরাম করো

এই কথাটিও সঠিক নয়। তোমরা নিশ্চয়ই মুদ্রাস্ফীতির কথা শুনেছ। ধরো, তুমি ব্যাংকে ১ লক্ষ টাকা জমা রেখেছ। ব্যাংক তোমাকে ৬% সুদ প্রদান করল (আমি জানি তুমি রাখবে না, কারণ সুদ হারাম)। বছর শেষে তুমি পেলে ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। তুমি হয়তো ভাবছ তোমার ৬ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। ভুল। এখন মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ১০%। তার মানে এখন ১ লক্ষ টাকা তোমার কাছে থাকলে ১ বছর পর সেটির মূল্য ৯০ হাজার টাকার সমান। কাজেই বেশি বেশি ইনকাম করে টাকা জমানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তাহলে আমরা কি টাকা সঞ্চয় করব না? অবশ্যই করব। অল্প অল্প করে প্রতিমাসে সঞ্চয় করার অভ্যাস করতে হবে। একই সাথে এই টাকা কীভাবে নিজের ব্যবসায় কিংবা আস্থাভাজন অন্য কারও ব্যবসায় ইনভেস্ট করে লাভবান হওয়া যায় সেটি আয়ত্ত করতে হবে। তবে সাবধান! না বুঝে দুটির যেকোনো একটিতে গেলে ধরা খাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। ২০১১ সালে বাংলাদেশ শেয়ার মার্কেটে স্ক্যামে লাখলাখ মানুষ পুঁজি খুইয়েছিল। একটু মনে করিয়ে দিলাম।

**শুধু হার্ডওয়ার্ক আমাদের ভাগ্য ফেরাতে যথেষ্ঠ নয়, স্মার্ট ওয়ার্ক করা শিখতে হবে।**

## ছাত্রদের ফাইন্যান্সিয়াল প্লানিং করার আগে

মূল আলোচনায় যাবার আগে চলো কিছু বাস্তবতা আগেভাগে মেনে নিই।

**এক.** বেশিরভাগ স্টুডেন্টের নিজের চলার মতো টাকা থাকে না। এই সময়ে টাকা সঞ্চয় করা, ফাইন্যান্সিয়াল বাজেট করা, স্মল ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান করা আসলেই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আপাত দৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভবকে কীভাবে সম্ভব করা যেতে পারে সেটা নিয়েই আজকের আলোচনা।

**দুই.** অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ করার কোনো শর্টকাট কিংবা জাদুকরী রাস্তা নেই। এটি খুবই দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে কত সময় লাগতে পারে। দেখো, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম রাতারাতি আসবে না। তুমি ধীরে ধীরে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে একটু একটু করে স্বাচ্ছন্দময় হয়ে উঠবে। স্বাভাবিকভাবে অনেক বছর লেগে যাবে। কাজেই ধৈর্য্য রাখতে হবে।

**তিন.** এই লেখা পড়ার সময় তোমার হয়তো মনে হতে পারে, আরে ধুর! এইসব কথাবার্তা আমি তো জানি। আসলে বেশিরভাগ জানা কথাগুলো আমাদের জানা বেশি জরুরি। আমরা চেষ্টা করব নিষ্ঠার সাথে উপলব্ধি করতে এবং সেই অনুযায়ী মেনে চলতে।

**চার.** অনেক ক্ষেত্রে এমন হওয়াটা খুব স্বাভাবিক যে, তুমি খুব সিরিয়াসলি একটি পরিকল্পনা করে দৃঢ় প্রত্যয়ে সেই অনুযায়ী চলার চেষ্টা করছ। কিন্তু কিছুদিন পর হয়তো বন্ধুদের প্ররোচনায় কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবে তোমার পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেছে। যার ফলে তুমি আবার আগের মত বেহিসেবি চলতে শুরু করেছ। মনে রাখবে, তুমি যে অবস্থাতেই পতিত হও না কেন, সেখান থেকেই আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে। একবার,

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুইবার ব্যর্থ হয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। এর মানে এই নয় যে, সব শেষ হয়ে গেছে।

**পাঁচ.** হতাশ হওয়া যাবে না। আজকাল হতাশ হয়ে যাওয়া এক ধরনের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। যত বাজে ঘটনায় ঘটুক না কেন, সাময়িকভাবে হয়তো খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু সেই মন খারাপ সামলে নিয়ে দ্রুত কাজে নেমে পড়তে হবে। হতাশ হওয়া চলবে না।

**এতগুলো নেগেটিভ কথা বললাম। এবার কিছু ইতিবাচক কথা বলি তোমাদের।**

**এক.** তোমাদের হাতে অফুরন্ত সময়। আল্লাহ তাআলা যদি হায়াত দেন, তোমরা অনেক সময় পাচ্ছ নিজেকে পরিবর্তন করার। একবার চিন্তা করো, যাদের বয়স পঞ্চাশের বেশি অথচ এখনও দরিদ্র! ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য অজস্র সময় তোমরা পাবে। দুই-চার-পাঁচবার ভুল করা কোনো ব্যাপারই না।

**দুই.** সংসারের তেমন কোনো দায়িত্ব তোমাদের নিতে হচ্ছে না। সংসার-স্ত্রী-সন্তান থাকলে অনেক দায়িত্ব চলে আসে। তখন অনেক কিছু মন চাইলেই পারা যায় না। কাজেই যা করার এখনই করতে হবে।

(যারা ইয়াতীম কিংবা অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে, তাদের জন্য আমার গভীর সমবেদনা। তোমাদের এই যাত্রা অনেক চ্যালেঞ্জিং, অনেক কষ্টের। হতাশ হবে না। তোমাদের অধিক কষ্টের প্রতিদান আল্লাহ দিবেন ইনশাআল্লাহ।)

## তুমি কি জানো কোন মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ধনী?

একটি তথ্য জেনে রাখো। পৃথিবীতে মাত্র ১% মানুষ পুরো পৃথিবীর ৪৮% সম্পদ দখল করে রেখেছে। প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন মানুষ, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মোট সম্পদের মাত্র ১% এর ওপর বেঁচে থাকে। পৃথিবীর সম্পদের সঠিক বণ্টন হলে কী হতো একটু ধারণা দিই। ধরা যাক, পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭ বিলিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য টেক্সাসের আয়তন ২৬৮,৮২০ বর্গমাইল অর্থাৎ ৭,৪৯৪,২৭১,৪৮৮,০০০ বর্গফুট। পৃথিবীর সবগুলো মানুষকে যদি টেক্সাসে রাখা হয় তাহলে প্রতি ৪ জনের একটি পরিবার পেতে পারে ৪০০০ বর্গফুটের একটি বাগানসহ আলিশান বাড়ি। চিন্তা করে দেখো, সম্পদ বণ্টনের কী অবস্থা। যাই হোক, এসব নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। চলো দেখি, কোন মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি ধনী।

আমরা দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, ঘুষখোর, দখলদার রাজনৈতিক, চোরাকারবারি ইত্যাদি যত দুই নম্বর পেশাদার আছে এদেরকে আপাতত আলোচনা থেকে বাদ রাখছি। কিন্তু কেউ যদি সত্যি সত্যি মেধার মাধ্যমে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায় তা কীভাবে সম্ভব? চলো দেখে নিই, কোন পেশাজীবীর মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন।

## Cashflow Quadrant

বিখ্যাত নিউয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার লেখক, পার্সোনাল ফাইন্যান্স এক্সপার্ট Robert Kiyosaki রচিত *Rich Dad's Cashflow Quadrant* বইতে মানুষের পেশাকে গড়পড়তা চার ভাগে ভাগ করেছেন।

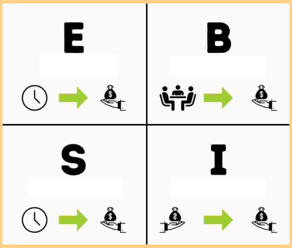


**Employee (E)**

চতুর্ভুজের E অংশে সকল চাকুরিজীবীদের বোঝানো হয়েছে যারা নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকে। এই ভাগের পেশাজীবীদের আয় নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত বিরতিতে সাধারণত এদের বেতনভাতা বৃদ্ধি পায়।

**Self-employed (S)**

Self-employed বা স্বনির্ভর লোকজন চুক্তিভিত্তিক অর্থায়নে অন্যদের সার্ভিস প্রদান করে। ফ্রিল্যান্সার, ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার কিংবা আইনজীবীরা এই শ্রেণিভুক্ত। চাহিদা এবং দক্ষতা অনুযায়ী এদের আয় চাকুরিজীবীদের চেয়ে কম বেশি হতে পারে। Robert Kiyosaki ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও এই শ্রেণিতেই রেখেছেন।

**Business owner (B)**

যাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে—যেখানে অনেক মানুষ প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে—তারাই B ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায় যেহেতু আয় বাড়ানোর অবারিত সুযোগ থাকে পৃথিবীর অনেক ধনী ব্যক্তিরাই এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত।

**Investor (I)**

ইনভেস্টর হচ্ছে যারা অন্যের ব্যবসায় টাকা-পয়সা ইনভেস্ট করে আয় করে থাকে। ধনীদের আরও ধনী হওয়ার জন্য ইনভেস্টর হবার বিকল্প নেই। তবে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা কিংবা সুদে টাকা লগ্নি করা কোনোভাবেই ইনভেস্টমেন্ট বলা যাবে না।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, E এবং S অংশের পেশাজীবীরা কিন্তু অনেক হার্ডওয়ার্ক করে। কিন্তু তারা যদি B কিংবা I ক্যাটাগরিতে নিজেদের উন্নীত করতে না পারে তাহলে কিন্তু ধনী হওয়া বেশ কঠিন। আমাদের সময় যেহেতু সীমাবদ্ধ, কাজেই E এবং S ক্যাটাগরির মানুষেরা শুধু তাদের শ্রম বিনিয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে আয় করতে পারে না। কিন্তু B এবং I দের এই সীমানদ্ধতা নেই। কেননা ব্যবসায়ীদের (B) ক্ষেত্রে অন্য মানুষ তাদের হয়ে কাজ করে এবং ইনভেস্টরদের (I) ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা/এসেট তাদের হয়ে কাজ করে। কাজেই লজিক্যালি B এবং I এর ক্ষেত্রে আনলিমিটেড আয় করার সুযোগ থাকে।

তবে এখানে কথা আছে। বর্তমানে E এবং S ক্যাটাগরিতে একটা হ্যান্ডসাম এমাউন্ট ইনকাম করা সম্ভব। ধরো, কেউ যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় দক্ষ হয়ে গুগলে জব করতে পারে, তাহলে ভালো একটি স্যালারি আয় করতে পারবে। একইভাবে ক্রিয়েটিভ কাজ শিখে ফ্রিল্যান্সিং করে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে অনেক টাকা আয় করা যায়। এই ক্যাটাগরির বেশিরভাগ মানুষের লক্ষ্য থাকে টাকা-পয়সা ইনকাম করে বাড়ি-গাড়ি বানিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন উপভোগ করা। B এবং I ক্যাটাগরিতে যেহেতু মেন্টাল স্ট্রেস অনেক বেশি থাকে, কাজেই কেউ যদি স্বেচ্ছায় প্রথম চয়েস গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু মন্দ না। তবে দক্ষতার সাথে সঠিক উপায়ে ব্যবসা করলে কিংবা স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট করতে পারলে আনলিমিটেড আয় করা সম্ভব।

> **ব্যবসা হচ্ছে এমন জিনিস, যেখানে অন্য মানুষেরা তোমার হয়ে কাজ করবে। আর ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে টাকা-পয়সা তোমার হয়ে কাজ করবে।**

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সবাই কি তাহলে B এবং I ক্যাটাগরিতে যাবে? উত্তর হচ্ছে, না। এই দুই ক্যাটাগরিতে রাতারাতি যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে অনেক বেশি ঝুঁকি থাকে। পর্যাপ্ত দক্ষতা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা না থাকলে লস হবার সম্ভাবনা অনেক প্রবল।

## স্টুডেন্টদের জন্য করণীয়

স্টুডেন্টদের জন্য কখনোই শুরুতে B কিংবা I তে যাওয়া উচিত নয়। ক্যারিয়ারের শুরুতে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিংবা স্টুডেন্ট অবস্থায় এমন একটি দক্ষতা অর্জন করতে হবে যেটির লং টার্ম চাহিদা থাকে। যেমন- অ্যানিমেশন কিংবা প্রোগ্রামিংয়ের চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। কেউ যদি এই ধরনের কোনো বিষয়ে অ্যাডভান্সড এবং ইন ডেপথ জ্ঞানলাভ করতে পারে তাহলে কিন্তু তার জন্য নিরাপদ। এই দক্ষতা তাকে নেক্সট লেভেলে যেতে সাহায্য করবে। অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য এটি হচ্ছে প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক সচেতনতা বাড়ানো।

## অর্থনৈতিক সচেতনতা

এ বিষয়ে ষোলোর আগের দুই পর্বে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই সচেতনতা হচ্ছে এক ধরনের মাইন্ডসেট। তুমি হয়তো অনেক বড়লোকদের দেখে থাকবে তারা প্রয়োজনে লক্ষ টাকা খরচ করবে, অপ্রয়োজনে পাঁচ টাকাও খরচ করে না। এর মানে এই না তারা কৃপণ। এটি একটি মাইন্ডসেট। তোমাকে এই মাইন্ডসেট রাখতে হবে যে, আমি বিনা প্রয়োজনে কোনো খরচ করব না। তোমার কাছের বন্ধু গ্যাজেট কিনলেও তুমি কিনবে না। জুড়াজুড়ি করলেও কিনবে না; ঠিক আছে? তোমাকে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য এটুকু ত্যাগ এবং নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। তার মানে তোমাকে খরচের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ইনকাম বেশি করেও একজন মানুষ গরিব হয়ে যেতে পারে যদি সে তার খরচ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে।

**অনেক টাকা ইনকাম করেও মানুষ দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, যদি খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে না শেখে। কাজেই মানি ম্যানেজমেন্টে দক্ষ হতে হবে।**

প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই নিয়ন্ত্রণ শক্তি বাড়ানো যায়। এটি অর্থনীতি চ্যাপ্টারের বাইরের আলোচনা। তবুও সংক্ষেপে বলি। আমাদের অবচেতন মনের কাছে অটোসাজেশন পাঠাতে হবে যে, আমি এই কাজটা করতে পারব। নিউরো সাইন্টিস্টদের গবেষণা অনুযায়ী, আমাদের ব্রেইনের ৯৫ ভাগ কাজ অবচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের বেশিরভাগ আবেগ, কাজ, আচরণ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সাবকনশাস মাইন্ড কন্ট্রোল করে। কাজেই, আমরা আমাদের কিছু কাজ সাবকনশাস মাইন্ডের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি এক্সেকিউট করার জন্য। কীভাবে? অটোসাজেশনের মাধ্যমে। আমাদের মাইন্ডকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, আমি অমুক কাজটি করতে চাই। মনে রাখবে, আমাদের ব্রেইনের কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। আমার কথা শুনে হাসছ। মানে বলতে চাচ্ছি, একটি ঘটনা চাক্ষুস ঘটলে ব্রেইন যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি তুমি যদি বারবার কল্পনা করো ব্রেইন সেটিও বিশ্বাস করে। তোমার কাজ হচ্ছে ব্রেইনকে বিশ্বাস করানো যে, তুমি এই কাজটি করতে পারবে। তাহলেই হলো। অটোসাজেশন নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলে অনেক কিছু জানতে পারবে।

## উপসংহার

হুট করে এই লেখা থামিয়ে দিতে হচ্ছে। কেননা ইতোমধ্যে এটি বেশ বড় হয়ে গেছে। তবুও যারা এই পর্যন্ত পড়েছ তাদের অভিনন্দন। এই লেখাটি চলবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সামনে আরও অনেক বিষয়ে আলোচনা করব। যেমন - সঞ্চয় এবং বাজেটিং, ফাইন্যান্সিয়াল গোল, লোন হ্যান্ডলিং, আর্লি ইনভেস্টমেন্ট, ছোট ছোট উদ্যোগ, পার্সোনাল ফাইন্যান্স এডভাইসর ইত্যাদি। সবাই ভালো থাকো, পার্সোনাল ফাইন্যান্স এবং মানি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা অব্যাহত রাখো।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# কমিকস

মূল : দ্যা মুসলিম শো
অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল গালিব

আমরা যা শিখলাম : কিছু কষ্ট আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে আসে; আর কিছু স্বাচ্ছন্দ্য আমাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# রহস্যজট

## এক.

আহমেদ সাহেবের কুরবানির গরু চুরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করতে হাজির হলো বিশিষ্ট গোয়েন্দা আবির। সন্দেহভাজন পাঁচজন — বল্টু, বশির, চান্দু, ডাব্বু আর এমদাদকে গোয়েন্দা আবিরের সামনে হাজির করা হলো। চলল জিজ্ঞাসাবাদ। আবিরের প্রশ্নের কঠিন মারপ্যাঁচে পড়ে সন্দেহভাজনেরা যা বলল, তা এ রকম :

বল্টু : এমদাদ চোর নয়। চোর হলো বশির।
বশির : চান্দু চোর নয়। এমদাদও চোর নয়।
চান্দু : এমদাদ ব্যাটা চোর। বল্টু চোর নয়।
ডাব্বু : চান্দু চোর। বশিরও চোর।
এমদাদ : ডাব্বু হলো আসল চোর। বল্টু চুরি করেনি।

গোয়েন্দা আবির জানে, এদের প্রত্যেকেই একটা সত্য কথা আর একটা মিথ্যা কথা বলেছে। এখন বলো দেখি, কে আসল চোর ?

## দুই.

স্কুলের প্রথম দিনেই বিজ্ঞানের শিক্ষককে তার ক্লাসরুমে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। চারজন সন্দেহভাজন ছিল, সন্দেহভাজন চারজনকে গোয়েন্দা আবিরের সামনে হাজির করা হলো। চলল জিজ্ঞাসাবাদ। আবিরের প্রশ্নের কঠিন মারপ্যাঁচে পড়ে সন্দেহভাজনেরা যা বলল, তা এ রকম :

বাগানের মালী : স্যার, আমি বাগানের আগাছা পরিষ্কার করছিলাম।
ফুটবল কোচ : আমি বছরের প্রথম টুর্নামেন্টের জন্য প্ল্যান করছিলাম।
গণিত শিক্ষক : আমি এক ক্লাসে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।
অধ্যক্ষ : আমি দুজন অভিভাবকের সাথে পরামর্শ করছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা আবিরের নির্দেশে পুলিশ গ্রেফতার করে গণিত শিক্ষককে। কেন ?

! রহস্যের জট খুলে পাঠিয়ে দাও quiz.sholo@gmail.com এই ঠিকানায়। আর সেরা পাঁচজন গোয়েন্দা জিতে নাও ষোলোর পরবর্তী সংখ্যা। উত্তর পাঠাতে হবে ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে। উত্তর পাঠানোর সময় তোমার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বারও লিখে দেবে।

গত সংখ্যার 'রহস্যজট' বিজয়ীরা হলো :
মোঃ রাহাদ উল্লাহ, রাওহা নাহরীন, মারুফ বিল্লাহ

গত সংখ্যার উত্তর জানতে QR Code স্ক্যান করো

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# অতীত শত্রুর কাফফারা (১ম পর্ব)

আলী আবদুল্লাহ

না, মক্কায় আর থাকা সম্ভব না। ইকরিমা ইবনু আবু জাহল পালিয়ে যাচ্ছেন। ঘর-দুয়ার, স্ত্রী ছেড়ে। লজ্জিত অবস্থায় মাথা নিচু করে পালাচ্ছেন। মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি মুসলিমদের মক্কা বিজয় রুখতে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শেষ প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোট্ট সেনাবাহিনীর আক্রমণে সেই প্রতিরোধ ভেস্তে গেছে। ইকরিমার বাহিনীর অনেকেই মারা পড়েছে। কোনোমতে জান নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছেন ইকরিমা ইবনু আবু জাহল।

যদিও মক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আগেই কথা দিয়েছিল যে, তারা মক্কা বিজয়ে কোনো প্রতিরোধ গড়বে না, কিন্তু ইকরিমা ইবনু আবু জাহল কুরাইশদের কথার দাম রাখেননি। তিনি একটা শেষ সুযোগ নিয়েছেন মুসলিমদের আটকে দেওয়ার। কুরাইশদের হয়ে শেষ প্রতিরোধ গড়েছেন তিনি। কারণ তার গায়ে যার রক্ত বইছে, সেই মানুষটিকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল মুসলমান বাহিনী। হ্যাঁ, ইকরিমার গায়ে যার রক্ত বইছে সে হলো কুরাইশ নেতা আমর ইবনু হিশাম। যাকে কুরাইশরা এক সময় আবুল হাকাম (জ্ঞানীর পিতা) বলে ডাকত। এখন ডাকে আবু জাহল (মূর্খের পিতা) বলে। মুসলিমদের সব থেকে বড় শত্রু ছিল ইকরিমার বাবা আবু জাহল। নিজের বাবার নেতৃত্বেই ইকরিমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুতায় আত্মনিয়োগ করেছিল তখন। মুসলিমদের ব্যাপারে ইকরিমা তার বাবার মতোই ছিলেন ভীষণ কঠোর। তার অত্যাচারে তৎকালীন মুসলিমদের জীবন হয়ে গিয়েছিল দুর্বিষহ। মুসলিমদের প্রতি ইকরিমার এই নিষ্ঠুরতা তার পিতা আবু জাহলকে বেশ আত্মতৃপ্তি দিত।

বদরের যুদ্ধেও ইকরিমা তার বাবা আবু জাহলের সাথে মুসলিমদের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আবু জাহলের ডান হাত। তাদের বাহিনী বদরের প্রান্তরে তিন দিন অবস্থান করেছিল। মদপান করেছে, উট জবাই করে খাওয়াদাওয়া, গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে নাচে মত্ত হয়ে কেটেছিল কুরাইশদের সময়। কুরাইশদের বাহিনী ভেবেছিল, অল্প কিছু মুসলিমকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে তারা। আবু জাহল তো তাদের দেবতা লাত ও উযযার নামে শপথ করেছিল যে, মুসলিমদের শেষ না করে সে মক্কায় ফিরবে না। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। সেই বদরের ময়দানেই লাঞ্ছিত পরাজয় বরণ করতে হয় কাফির কুরাইশদের। মুসলিম বাহিনীর দুই যুবক আবু জাহলকে হত্যা করে। আবু জাহল মুখ থুবড়ে পড়ে। ইকরিমা সেই দিন নিজের চোখেই দেখেছিলেন তার পিতাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে।

সেই দিন ইকরিমা বাবার লাশটাকেও মক্কায় নিয়ে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসতে পারেননি। পালিয়ে আসতে হয়েছিল যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে। কাফির কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় ইকরিমাকে তার বাবার লাশটাও দাফন করার সুযোগ দেয়নি। মুসলিমরা তার বাবার লাশ অন্যান্য কাফিরের লাশের সাথে কালীব নামক কূপে ফেলে মাটি চাপা দিয়েছে। আর সেই দিন থেকেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে ইকরিমার মনে। এবং তিনি হয়ে গেছেন মুসলিমদের অন্যতম শত্রু।

উহুদের যুদ্ধে ইকরিমা ছিলেন কুরাইশদের পক্ষ থেকে অগ্রগামী। ইকরিমার স্ত্রীও উহুদের যুদ্ধে তার সঙ্গী হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে যে নারীরা ভাই হারিয়েছে, সন্তান কিংবা স্বামী হারিয়েছে, সেই সব নারীদেরকে সাথে নিয়ে ইকরিমার স্ত্রী উম্মু হানিও চলে এসেছিলে উহুদের ময়দানে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাদ্য বাজিয়ে কুরাইশ সৈন্যদের উৎসাহ দেওয়া।

উহুদের সেই দিন কুরাইশরা তাদের অশ্বারোহী সৈনিকদের ডান দিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং বাম দিকে ইকরিমা ইবনু আবু জাহলকে নিয়োগ করেছিল। সেই দিন কাফিরদের এই দুই সাহসী যোদ্ধা মুসলিমদের কাছ থেকে উহুদের বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসে কুরাইশদের জন্যে। আবু সুফিয়ান সেই দিন গর্ব করে বলেছিল, 'এটা বদরের দিনের প্রতিশোধ।'

**উহুদের সেই দিন কুরাইশরা তাদের অশ্বারোহী সৈনিকদের ডান দিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং বাম দিকে ইকরিমা ইবনু আবু জাহলকে নিয়োগ করেছিল। সেই দিন কাফিরদের এই দুই সাহসী যোদ্ধা মুসলিমদের কাছ থেকে উহুদের বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসে কুরাইশদের জন্যে।**

ইকরিমা তার জীবনে ইসলামকে কখনো ছাড় দিতে চাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কীভাবে ধ্বংস করা যায়, সেই চেষ্টা তার মধ্যে ছিল সবসময়। খন্দকের যুদ্ধের সময় কুরাইশ বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে। কিন্তু কাফিররা খন্দকের কারণে মদীনায় প্রবেশ করতে পারেনি। তারা বেশ কিছুদিন মদীনাকে অবরুদ্ধ রাখল। তখন এক সময় ইকরিমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি খন্দক পার হয়ে মদীনার ভেতর প্রবেশ করার পথ খুঁজতে লাগলেন। একসময় দেখতে পেলেন খন্দকের এক স্থানে সংকীর্ণ একটা পথ। ইকরিমা সাহস করে সেই পথ দিয়ে তার ঘোড়া নিয়ে খন্দক পার হয়ে গেলেন। তার সাথে তাকে অনুসরণ করে খন্দক পার হলো আরও কিছু কাফির সৈনিক। কিন্তু তারা খুব বেশি সুবিধা করতে পারল না। তাদের আক্রমণ করে বসল মুসলিম সৈনিকেরা। তারা কোনোভাবে মুসলিম সৈনিকদের আক্রমণ থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে পালাল। সেই সময় ইকরিমার একজন সঙ্গী আমর ইবনু আব্দি উদ্দ আল আমিরী প্রাণ হারাল মুসলিম সৈনিকদের হাতে। এভাবে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পরও ইকরিমা সবসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরোধিতা করে গেছেন। এমনকি মুসলিমদের মক্কা বিজয়ের আগ মুহূর্তেও তিনিই শেষ প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছেন।

এখন তিনি ব্যর্থ। সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন মক্কা ছেড়ে। মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ইকরিমা ইবনু আবু জাহল এই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত নয়। মোট ছয়জনকে এই সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এরা হলো ইকরিমা ইবনু আবু জাহল, আব্দুল্লাহ ইবনু আবু সারাহ, মাকিস ইবনু সুবাবা, আব্দুল্লাহ ইবনু খাতান এবং দুইজন দাসী। এদের অন্যায় হলো, এরা মুসলিমদের বিপক্ষে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করার

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পাশাপাশি প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করত। মুসলিমদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ছয়জন ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হবে না। এরা যদি কাবার গিলাফ ধরেও নিরাপত্তা চায়, তবুও এদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে না। বরং যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে।

সুতরাং যেচে পড়ে নিজেকে মুসলিমদের হাতে সঁপে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ইকরিমা ইবনু আনী জাহল তাই জাহাজে করে লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। গন্তব্য আবিসিনিয়া। জাহাজে ওঠার পর সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। এখন আর কিছুই ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে না। ভয়াবহ ঝড় শুরু হয়েছে। ঢেউয়ের বাড়িতে ভয়াবহভাবে দুলছে জাহাজ। যেকোনো সময় ডুবে যাওয়ার উপক্রম। জাহাজের সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে আরোহীদেরকে লাত, উযযা কিংবা অন্য কোনো উপাস্যকে বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি আরোহীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

“হে মানুষেরা, প্রার্থনা করো। তোমাদের রব আল্লাহর কাছে মন থেকে অকপটে প্রার্থনা করো। কারণ এই পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।”

জাহাজের ক্যাপ্টেন তার আরোহীদেরকে যা বলেছেন সেটা হলো- আল্লাহই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে সবাইকে রক্ষা করতে পারে। অন্য কোনো মূর্তি কিংবা দেবতা তাদেরকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং সবাই যেন অন্যান্য দেবতাদের উপাসনা বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

**ইকরিমা ইবনু আবু জাহল যখন জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এই কথা শুনলেন, তিনি বললেন, “ওয়াল্লাহি! যদি আমার দেবদেবী মূর্তির সমুদ্রে এই পরিস্থিতিতে আমাকে সাহায্য করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে জমিনেও আমাকে সাহায্য করার সামর্থ্য এদের নেই।”**

এরপর ইকরিমা আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! আমি শপথ করছি, যদি আমি এই পরিস্থিতি থেকে বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে আমি ফিরে যাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত দেবো। আমি তাঁকে বিনয়ী এবং ক্ষমাশীল হিসেবেই পাব।”

ইকরিমা ইবনু আবু জাহল দুআ করলেন একমাত্র আল্লাহর কাছে। ইখলাসের সাথে দুআ করলেন। দুআ কবুলের ইখতিয়ার আল্লাহর। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ইখলাস মিশ্রিত দুআ কখনো ফিরিয়ে দেন না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ডেঙ্গু জ্বর : লক্ষণ ও করণীয়

বায়েজিদ মাহমুদ
MBBS, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

বর্তমানে আমাদের দেশে বহুল আলোচিত, প্রাণঘাতি ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। চলো, শুরু করা যাক।

ডেঙ্গু জ্বর হলো এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুর জীবাণু দ্বারা সংঘটিত একটি রোগ। এই রোগের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় ২৬৫-৪২০ সালে চীনা বিশ্বকোষে। তবে ১৭৭৯ সালে রাশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকা এই রোগের কারণে মহামারির কবলে পড়েছিল।

বাংলাদেশে ১৯৬০ সাল থেকে ২০১০ এর মধ্যে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডেঙ্গু জ্বর সংক্রমণের উচ্চ হার লক্ষ করা যায় বর্ষাকালে, শহর ও উপশহর এলাকার জনগোষ্ঠীতে।

## কিছু বিষয় জেনে নিই

এডিস মশা : স্ত্রী এডিস মশা ডেঙ্গুর জীবাণুর বাহক। এরা যখন মানুষকে কামড়ায় তখন ত্বকের মাধ্যমে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। এডিস মশা ডোরাকাটা দাগযুক্ত। এরা ৪-৫ দিনের স্বচ্ছ জমানো পানিতে ডিম পাড়ে। এডিস মশা মূলত দিনের বেলায় কামড়ায়।

## রোগ লক্ষণ ও ধারাবাহিকতা

ভাইরাস দেহে প্রবেশের পর ৪-৭ দিনের মধ্যে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। উপসর্গগুলো ১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি উপসর্গহীন থাকে।

### প্রথম ৫ দিন :

- উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর, যা প্রায় ১০৪° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
- শরীরে কাঁপুনি, তীব্র মাথাব্যথা, চক্ষুকোটরের পেছনে ব্যথা।
- হাড়ের জোড়ায় বা গিঁটে এবং মাংসপেশিতে ব্যথা। প্রবল ব্যথার কারণে একে হাড়ভাঙা জ্বরও বলা হয়।

### ৫-৭ দিন :

এক্ষেত্রে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম দেখা দিতে পারে। এসময় যা হতে পারে—

- নাক, মাড়ি, দাঁত হতে রক্তপাত, মলের সঙ্গে রক্তপাত।
- নাড়ি দুর্বল ও হৃদস্পন্দন দ্রুত। রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যায়।
- রক্তচাপ, নাড়ির স্পন্দন পাওয়া যায় না। রোগী শকে চলে যায়।

রক্তে প্লাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে যাওয়া জটিলতার লক্ষণ। প্লাটিলেট প্রতি মিলিমিটারে ২০,০০০ এর চেয়ে কমে গেলে বা হেমাটোক্রিট-এর মান বেড়ে গেলে তা মারাত্মক জটিলতা নির্দেশ করে।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## চিকিৎসাব্যবস্থা :

ডেঙ্গু জ্বরের সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই। ৭ দিনের মধ্যে বেশিরভাগ রোগী আরোগ্য লাভ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে চিকিৎসা করে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। জ্বর লাঘবে প্যারাসিটামল, পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং বেশি বেশি তরল খাবার পানীয় যথেষ্ট।

তবে ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। জ্বর চলে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরও রোগী অসুস্থতা অনুভব করলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। প্রয়োজনে রক্ত বা প্লাজমা সঞ্চালন করতে হবে। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে ICU তে চিকিৎসা নিতে হবে।

## প্রতিরোধ-ই সমাধান :

ডেঙ্গুর স্বীকৃত কোনো টিকা নেই, এন্টিভাইরাল কার্যকর নয়। অতএব প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। এক্ষেত্রে যে পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে—

১. মশার আবাসস্থল ধ্বংস করা, ফুলের টব, ডাবের খোসা, ক্যান, গাড়ির টায়ার, গর্ত ইত্যাদি স্থানে যেন পানি না জমে সেদিকে নজর রাখা।

২. মশক প্রজননের স্থানে কীটনাশক ও ঘরে মশা তাড়ানোর রিপেলেন্টস ব্যবহার করা।

৩. দিনের বেলা এবং রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করা।

৪. সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার করে নিচের দুআ পাঠ করা।[১]

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(উচ্চারণ : আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক)

এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইছি।

পরিশেষে বলা যায়, সবার সচেতনতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রাণঘাতি এ রোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি। মহান আল্লাহ তাআলা এ প্রচেষ্টায় আমাদের সহায় হোন। আমীন।

[১] গত সংখ্যায় এ দুআ নিয়ে আমরা বিস্তারিত লিখেছি। পড়ে নাও এই লিংক থেকে- https://tinyurl.com/DuaSeries2

## বিজ্ঞানের কচকচানি

- **টিউবয়েলের পানি শীতে গরম আর গ্রীষ্মে ঠান্ডা থাকে কেন ?**

টিউবয়েল থেকে যে পানি তোলা হয়, তা থাকে মাটির বেশ কিছুটা নিচে। মাটি তাপের কুপরিবাহী। অর্থাৎ মাটির ভেতর দিয়ে তাপ চলাচল করতে পারে না। গ্রীষ্মকালে বাইরের পরিবেশ অনেক গরম থাকে। কিন্তু মাটি তাপের কুপরিবাহী হবার কারণে এই তাপ মাটি ভেদ করে মাটির নিচের পানিতে যেতে পারে না। ফলে পানির তাপমাত্রার তুলনায় মাটির ওপরের তাপমাত্রা বেশি থাকে। তাই, পানি ঠান্ডা অনুভূত হয়।
এখন শীতকালে বাইরের বাতাসের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। কিন্তু মাটির ভেতর দিয়ে তাপ চলাচল করতে না পারায় মাটির নিচে পানির তাপমাত্রা কমে না। পানির তুলনায় বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকে। ফলে টিউবয়েল থেকে পানি তুললে সে পানি গরম লাগে।

- **নারিকেল তেল শীতকালে জমে যায় কেন?**

শীতকালে নারিকেল তেল জমে যায়। কারণ নারিকেল তেলে চর্বি বা ফ্যাট জাতীয় পদার্থ বেশি থাকে। শীতকালে তাপমাত্রা থাকে কম। কম তাপমাত্রায় নারিকেল তেলের চর্বি/ফ্যাট যায় জমে। আর এর ফলেই নারিকেল তেল জমে যায়।

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# এই অবেলায়..

ডা. শামসুল আরেফীন

কিশোর বয়সের সমস্যার কোনো শেষ নাই। আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি’ গল্পটি। নায়ক ফটিক-এর বয়স তেরো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়ই তোমাদের শোনাই, কেমন?

“বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাফ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধে হয়।

সেও সর্বদা মনে-মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ, এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিম্বা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।”

একটু কঠিন কঠিন লাগল? আচ্ছা। আমরা যত সামনে এগোব তত বুঝতে পারবে। কিশোর বয়সের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে লেখার আগে আমি আমার ৭ম-১০ম শ্রেণির ডায়েরিগুলো খুঁজে বের করলাম। সে সময় আমার আবেগ কেমন ছিল, কী ভাবতাম আমি সে বয়সে। যদিও জেনারেশন গ্যাপের দরুন তোমাদের ভাবনার সাথে আমার ভাবনা হয়তো খাপে খাপে মিলবে না। তোমরা এখন গ্যাজেট নিয়ে, টেকনো নিয়ে যত ভাবো, সেসময় আমাদের কল্পনায় অতকিছু এসে পারেনি। বস্তুগুলো ভিন্ন হলেও

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবেগগুলো একই থাকার কথা। মানুষের শরীর তো আর বদলায়নি, মানসিক প্রক্রিয়াগুলো তো আর বদলায়নি, তাই না!!

ঐ যে বললাম, কিশোর বয়সের সমস্যা বহুত। সমস্যা বেশি থাকাটা সমস্যা না। মূল সমস্যা হলো 'সমস্যাগুলো শেয়ার করার' লোক কম। কেউ কাছে ডেকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে দেবে, নেই। বাবা-মা ব্যস্ত, তাদের সময় নেই। সামান্য যেটুকু সময় তারা আমাদের দিতে পারেন, তার মাঝেই দ্রুত আমাদের বশে আনতে তাদের থেকে মেলে হয় অতিশাসন, নইলে একেবারেই বেখেয়াল। শিক্ষকরা টেক্সটবুক আর কোচিং-এর বাইরে সময়ক্ষেপণকে অলাভজনক ভাবেন। বাকি রইল বন্ধুবান্ধব, ওরা তো আমাদেরই সমান, এমন বেশি আর কী বোঝে? অথচ এই সময়টাতেই কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজন একজন সিনিয়র মেন্টর। যিনি শিশুর মতো প্রশ্রয়ও দেবেন, আবার এডাল্টদের মতো মূল্যায়নও করবেন; যেহেতু বয়সটাই দুটোর মাঝামাঝি।

কিন্তু সমস্যাগুলোর ধরন এমন যে, এখনই এগুলো সলভ হতে হবে। সমস্যাগুলো যদি আমরা এই ছোটবেলায়ই না ধরতে পারি, আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমরা যখন বড় হব, তখন সীমাহীন কষ্টে আমাদের জীবন ভরে যাবে, সে কষ্ট কাউকে বলাও যাবে না। এজন্য খুব মন দিয়ে আমাদের শুনতে হবে আজকের কথাগুলো। যত মন দিয়ে শুনব, তত সমস্যাটা বুঝতে পারা যাবে। আর যত বুঝতে পারা যাবে, তত আমরা সেই মহাসমস্যা থেকে বাঁচতে পারব। তবে তার আগে আমাদের দেহ কীভাবে কাজ করে সে ব্যাপারে কিছু ধারণা নেবো। এবং আমাদের এই বয়সে আমাদের দেহে কী কী পরিবর্তন আসে, তার ফলে মনে কী কী পরিবর্তন আসে, সেগুলো দেখব। চলো, শুরু করি আমাদের জার্নি।

## ছেলে নাকি মেয়ে

তোমরা যারা লেখাটি পড়ছ, সবাই বুদ্ধিমান, সচেতন। তোমার আশপাশে তাকাও। দেখো, মানুষ দুই প্রকার—নারী আর পুরুষ। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এই দুইপ্রকারই হয়। কেউ কেউ গর্ভকালীন জটিলতার দরুন অস্পষ্ট পরিচয় নিয়ে জন্ম নেয়। নারী বা পুরুষ কোনোটাই না, বরং দু'য়ের মাঝামাঝি কিছু অস্পষ্টতা থাকে তাদের। এদেরকে বলা হয় 'হিজড়া'। মেডিকেলের ভাষায় বলে Intersex বা যৌন প্রতিবন্ধী। সমাজকর্মীরা এদেরকে 'তৃতীয়লিঙ্গ' বলে। এদের জীবন খুব কষ্টের। বাবা-মা এদের দায়িত্ব নেয় না। সমাজে টিটকারির শিকার হয়। অন্য হিজড়ারা এদেরকে নিয়ে যায় নিজেদের কাছে। জীবিকার উপায় থাকে না। বেঁচে থাকার সম্বল কামাই করতে এরা চাঁদাবাজি ও নানান অশ্লীল কাজে জড়ায়।

তোমরা কি জানো, ইসলামে এদের অবস্থান কী? ইসলামী ব্যবস্থায় 'তৃতীয় লিঙ্গ' বলে কিছু নেই। লিঙ্গ দুইটাই— হয় পুরুষ, নইলে নারী। অস্পষ্ট যাদের, তাদেরকে সার্জারি ইত্যাদির দ্বারা স্পষ্ট করা হবে। নইলে সবচেয়ে বেশি মিল খায় কোনদিকে, সেমতে তাকে হয় নারী, নইলে পুরুষ—একটা দিকে ফেলা হবে। সে পিতার সম্পত্তি পাবে। কাজ পাবে। সমাজের মাঝেই ছেলে বা মেয়ে হিসেবে থাকবে। বিয়েও করতে পারবে চাইলে। নারী বা পুরুষের সকল সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার তার ওপর বর্তাবে। বুঝলে? আজ যদি ইসলামী ব্যবস্থা থাকত, এদেরকে এত কষ্টের জীবন কাটাতে হতো না। কত সুন্দর, না? হতেই হবে, এ ব্যবস্থা কে দিয়েছেন দেখতে হবে না? খোদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ দিয়েছেন। যিনি মানুষের বায়োলজি-সাইকোলজি জানেন। সবদিক বিবেচনা করে তিনি সমাধান দেন।

আজ তোমাদেরকে শোনাব, কীভাবে একটা বাবু মায়ের পেটে ছেলে হয় বা মেয়ে হয় বা হিজড়া হয়। শুনবে? চলো দেখি, তপু কীভাবে ছেলে

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিসেবে জন্মালো। তপুর মা-বাবার বিয়ে হলো। মায়ের প্রতিটা দেহকোষে ৪৬টা ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোম হলো কোষের মাঝে থাকা জরুরি তথ্যভান্ডার। নানান তথ্য থাকে এতে: সারা দেহের সবরকম তথ্য। চুলের রং থেকে নিয়ে দেহের ভেতর যত লক্ষ কাজ চলছে, সবকিছুর নকশা-ম্যাপ-ডিরেকশন থাকে। যত জিনিস আমাদের কোষে উৎপন্ন হয়, সব অর্ডার লেখা থাকে এখানে বিশেষ একটা ভাষায়। তোমরা DNA-এর নাম শুনেছ, জিন-এর নাম শুনেছ। ডিএনএ হচ্ছে সেই ভাষা। সে লম্বা আলাপ, অন্য আরেকদিন। তো এই ৪৬টা মানে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মাঝে দুইটাতে আছে তপুর মায়ের লিঙ্গপরিচয়। যেহেতু তিনি মেয়েমানুষ, তার এই দুটো ক্রোমোসোম হলো XX. তার দেহকোষের ডিজাইন হবে (৪৪+XX=৪৬)। ঠিক আছে?

এখন তপুর মায়ের কোষ থেকে যখন ডিম্বাণু তৈরি হলো, তখন দুই ভাগ হলো ক্রোমোসোমগুলো। ২৩টা-২৩টা হয়ে গেল। দেহকোষের অর্ধেক। ঐ XXও ভাগ হবে। তপুর মায়ের একটা ডিম্বাণুর নকশা হবে (২২+ X=২৩)। তপুর বাবার কেমন হবে? বাবার দেহকোষ হবে (৪৪+XY=৪৬)। এই Y হলো পুরুষের জন্য। Y না হয়ে X হলে তপুর বাবা পুরুষ হতেন না, মেয়ে হয়ে যেতেন। তাহলে এই (৪৪+XY)টাও ভাগ হবে যখন তপুর বাবার কোষ থেকে শুক্রাণু তৈরি হবে। তাহলে তপুর বাবার যে শুক্রাণু, সেটা কেমন হবে? কিছু (২২+X) হবে, আর কিছু হবে (২২+Y)। ঠিক তো? [চিত্র-১]

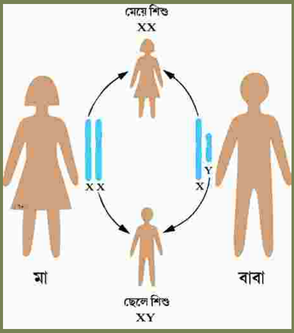

চিত্র-১

এখন দেখো, মায়ের ডিম্বাণু তো সবগুলো একপদেরই ছিল (২২+X)। কিন্তু বাবার শুক্রাণু হলো দুই টাইপ। তপুর বাবা-মায়ের ডিম্বাণু-শুক্রাণু যখন যুক্ত হলো ডিম্বাণুর (২২+X) এর সাথে, তখন হয় একটা (২২+X) শুক্রাণু যুক্ত হবে। তখন সেটা হয়ে গেল (৪৪+XX), মানে তপু হবে মেয়ে। আর তা না হলে যদি বাবার (২২+Y) যদি মায়ের ডিম্বাণু (২২+X) এর সাথে মিলে যায়, তবে সেটা হবে ৪৪+XY, মানে ঠিক তপুর বাবার মতো, মানে তপু হবে ছেলে। সহজ না? তার মানে তপুটা যেহেতু একটা পোলা, তার মানে তপুর বাবার (২২+Y) টাই তপুর শরীরে এসেছে।

এখন বলো আমাকে, এক লোকের শুধু মেয়ে বাবু হয়। তার স্ত্রী শুধু মেয়ে জন্ম দেয়, ৪টা মেয়ে। বউয়ের পেটে আরেকটা বাবু। এখন লোকটা বলল: এইবার যদি মেয়ে হয়, তবে তোকে তালাক। বলো দেখি, বারবার যে মেয়ে হয়, এটা কি ঐ বউটার কারণে, না কি বাবার কারণে? রাইট। বাবার (২২+X) বারবার কাহিনি ঘটাচ্ছে। মহিলার তো কেনো ভূমিকা নেই।

এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন এসেছে: তাহলে হিজড়া কীভাবে হয়? অনেকভাবে হতে পারে।[১] ক্রোমোসোমে সমস্যা থাকতে পারে। XY মিক্স থাকতে পারে, মোজাইকের মতো। আমরা দেখব অধিকাংশ হিজড়া কীভাবে হয়। শুধু XY হলেই তপু ছেলে হয়ে গেল? না না। মায়ের পেটে তপুর বয়স যখন ৬ সপ্তাহ (৪২ দিন), তখন এই Y ক্রোমোসোমের কারণে তপুর ছোট্ট কুঁড়ির মতো অণ্ডকোষ থেকে বের হতে থাকে হরমোনের বন্যা। টেস্টোস্টেরোন। তপুর রক্তে ছড়িয়ে পড়ে এ বস্তু। মগজ-টু-সারা বডি। এর কাজ হলো :

১. তপুর স্ত্রীটাইপ লিঙ্গ হওয়াকে বাধা দেওয়া

[১] https://interactadvocates.org/intersex-definitions/

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. পুরুষটাইপ লিঙ্গ তৈরি করা

৩. স্ত্রীটাইপ যা কিছু আছে সব বিলুপ্ত করা

৪. তপুর মগজকে পুরুষের মতো করে দেয়া (মগজে প্রচুর টেস্টোস্টেরোনের প্রতি সেন্সিটিভ রিসেপ্টর থাকে)

যদি এটা না হতো, তপুকে মেয়ে হওয়া থেকে Y-টা বাধা না দিত, তবে তপু মেয়ে হয়ে যেত। যদি কোনো কারণে Y-টা থাকা সত্ত্বেও দমন হয়ে থাকে। বা টেস্টোস্টেরোন তৈরি না হয়, তবে তপুর কোষ পুরুষ (XY) থাকলেও তার লিঙ্গ হবে কিছুটা মেয়েদের মতো বা অস্পষ্ট। মানে তপু হবে হিজড়া। অর্থাৎ এই ৪২ দিন বয়সের এই ঘটনাই ঠিক করে দেয় শিশুটা ছেলে হচ্ছে নাকি মেয়ে হচ্ছে নাকি হিজড়া হচ্ছে। তপুর বোন নাজিয়ার ক্ষেত্রে কী হয়েছে? যেহেতু নাজিয়ার Y নেই, সুতরাং কুঁড়ির মতো অণ্ডকোষ হতে পারেনি, টেস্টোস্টেরোন তৈরি হয়নি। ফলে স্ত্রীটাইপ লিঙ্গ-জরায়ু-ডিম্বাশয় তৈরি হতে কোনো বাধা পায়নি। মানে নারী হওয়া বাই ডিফল্ট। বাধা পেলে আমরা পুরুষ হই। ঠিক আছে না?

এখন তোমাদের একটা অন্য জিনিস শোনাই। সহিহ বুখারির হাদীস :

**‘আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করেন। ফেরেশতা বলেন, হে রব! এখনো তো ভ্রূণ মাত্র। হে রব! এখন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে রব! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান, তখন ফেরেশতা বলেন, হে আমার রব! (সন্তানটি) ছেলে না মেয়ে হবে, পাপী না নেককার, রিযিক কী পরিমাণ ও আয়ুকাল কত হবে? অতএব এভাবে তার তাকদীর মাতৃগর্ভেই লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।’** [সহীহ বুখারি, হাদীস নং: ৩০৮৭]

অনেকে তো ভুল ধরতে চায় যে, ছেলে-মেয়ে নির্ধারণ হয়ে যায় মা-বাবার শুক্রাণু-ডিম্বাণু মিলনের সময়ই, মায়ের গর্ভে নয়। সুতরাং ইসলাম ভুল। আরে বাবা, ছেলে-মেয়ে হবার অর্ডার হলো, ডিজাইনটা হলো। অর্ডার মোতাবেক কাজটা হবে কিনা, সেটা তো ঠিক হবে মায়ের পেটে। ছেলে হবে নাকি হিজড়া হবে? মেয়ে হবে, নাকি হিজড়া হবে? এটা ঠিক হলো তো এই ৪২ দিন বয়স থেকে। ১৪০০ বছর আগে যখন এসব কিছুই আবিষ্কার হয়নি, তখন আমাদের নবিজি এই কথাটা কীভাবে জানলেন? যাঁর পক্ষে জানা সম্ভব তিনিই নবিজিকে জানিয়েছেন, এ ছাড়া আর কোনো উত্তর হয় না।

এই সময়ে যেকোনো সমস্যা (হরমোন নির্গত না-হওয়া, কম বের হওয়া, হরমোন-রিসিভার তৈরি না-হওয়া ইত্যাদি) তপুকে ছেলে না করে হিজড়া করে ফেলত। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রেও হুট করে অন্য কোনো অজায়গা-বেজায়গা থেকে পুং-হরমোন বের হওয়া, মায়ের কোনো ওষুধ পুরুষ-হরমোনের মতো কাজ করা ইত্যাদির দরুন হিজড়া হয়ে যাবে। আল্লাহর শোকর যে, আমাদের এমনটা হয়নি। আসলে শরীরের কোষে কোষে এত লক্ষ বিক্রিয়া একই সাথে হচ্ছে, একটা যে আরেকটাকে বাগড়া দেয় না, এটাই বিস্ময়ের। এটাই আল্লাহর কুদরত। আল্লাহ তাঁর হুকুম দিয়ে এই ফাইন টিউনিং-টা করেন, যেটা হবার সেটাই যেন হয়। সুবহানাল্লাহ। সামনের পর্বে আমরা আরও নতুন নতুন ও দারুণ দারুণ জিনিস জানব ইনশাআল্লাহ। ততদিন আল্লাহর হকগুলো আদায় করতে ভুলো না। যিনি আমাদেরকে এতকিছু না চাইতেই দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, তাঁকে ভুলে যাবার মতো অকৃতজ্ঞতা তো কুকুরেও দেখায় না। আমরাও অকৃতজ্ঞ হব না, কেমন?

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# ধাঁধা

চিত্র-১ : ছবি দুটির মধ্যে তিনটি পার্থক্য বের করো

চিত্র-২ : ছবি দুটির মধ্যে চারটি পার্থক্য বের করো

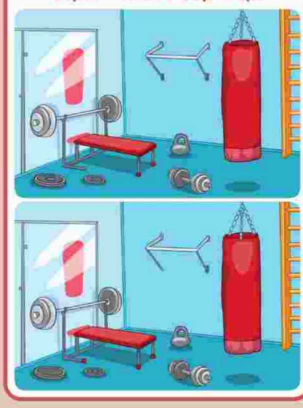

চিত্র-৩ : ছবি দুটির মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য বের করো

চিত্র-৪ : ছবি দুটির মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য বের করো

চিত্র-৫ : ছবি দুটির মধ্যে চারটি পার্থক্য বের করো

ছবিগুলোর মধ্যে **পার্থক্য খুঁজে বের করো**। পার্থক্য চিহ্নিত করে ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও ষোলো ভাইয়ার কাছে এই ঠিকানায় **quiz.sholo@gmail.com** ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে। মেইলের **সাবজেক্ট লিখবে- ধাঁধা**। পুরস্কার হিসেবে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে **৫ জন** পাবে ষোলোর পরবর্তী সংখ্যা।

**গত সংখ্যার গণিত ধাঁধা, বুদ্ধি খাটাও ও গুগলির সঠিক উত্তর-**

১. ২৪৫ ২. ৬ ৩. ঝালকাঠি ৪. সুইজারল্যান্ড
৫.২০টি ৬. বালতি = বা, লেবু = বু, ইলিশ = ই

গত সংখ্যার বিজয়ীরা হলো :

ফাহিম, মুহাম্মাদ আল-আমীন ফরহাদ, মুহাম্মাদ আরেফিন ইসলাম, নাহিদ হাসান, ফাহমিদা হাকিম সূচিতা

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেমন ছিল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা?
কেমন ছিল আমাদের অর্থব্যবস্থা?
কেমন ছিল উম্মাহর ১৪৫০ বছরের ইতিহাস?

**মুসলিম সভ্যতার শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য যে দুটি বই আপনাকে পড়তেই হবে!**

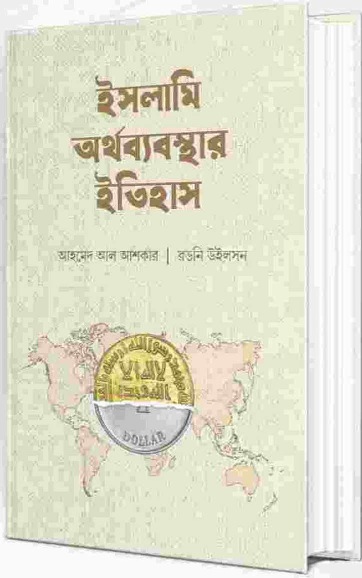


বই : ইসলামি অর্থব্যবস্থার ইতিহাস
লেখক : আহমেদ আল আশকার, রডনি ইউলসন
অনুবাদ : আশিক আরমান নিলয়,
সম্পাদনা : আহমদ সালেম নকি,
মাহমুদ সালমান জকি, জাকারিয়া মাসুদ
পৃষ্ঠা : ৫০৪
প্রচ্ছদ মূল্য : ৭০০ টাকা

বই : ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস
লেখক : কাজী আতাহার মুবারকপুরী
রাহিমাহুল্লাহ, ড. আহমাদ শালাবী
অনুবাদ : উমাইর লুৎফর রহমান,
আবদুল্লাহ যুবায়ের
ভাষা সম্পাদনা : জাকারিয়া মাসুদ
পৃষ্ঠা : ৪০৮
প্রচ্ছদ মূল্য : ৫৭০ টাকা

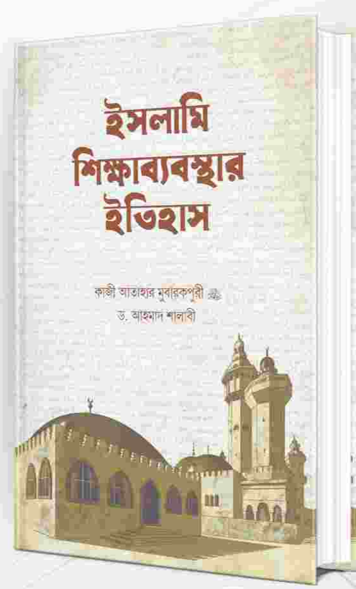


আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে জয়েন করুন আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ কিতাবিয়ান-এ!
লিংক- https://www.facebook.com/groups/kitabiyan

sondiponprokashon
www.sondipon.com
sondiponprokashon@gmail.com
০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯, ০১৪০৬ ৩০০ ১০০
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়তবা

A collection of 450+ articles,
PDF, audio & video

Download the App

Google Play

App Store

www.hoytoba.com